# সাত সমুদ্র তেরো নদী

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
( বনফুল )

বাণীশিল্প
১১৩ই, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

SAAT SAMUDRA TERO NADI

A Novel by

Sri Balaichand Mukhopadhyaya ( Banaful )

প্রথম প্রকাশ :

দোল পূর্ণিমা, ১৩৬৩ সাল।

প্রচ্ছদ শিল্পী :

সব্যসাচী গুপ্ত

প্রকাশক :

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ বেরা

বাণীশিল্প

১১৩ই, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

মুদ্রক :

তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীনিশিকান্ত হাটই

২৬, বিধান সরণী

কলিকাতা-৬

আমার ছোটবৌমা

শ্রীমতী চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু

# সাত সমুদ্র তেরো নদী

॥ ১ ॥

অদ্ভুত একটা যোগাযোগ হয়েছে এ গল্পটাতে। এই গল্পে যাঁরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সাতজন পুরুষ আর তেরো জন নারী। পুরুষদের নাম—সব সমুদ্রের নাম আর নারীদের নাম সব নদীর। কেন এরকম হোল তা কল্পনা দেবীই বলতে পারেন—তাঁর খামখেয়ালীর তো আদি অন্ত নাই।

যে গল্পটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছে সেটাও কেমন যেন জট-পাকানো। কোথা থেকে আরম্ভ করি ভাবছি। গল্পটা শুরু কোথায় হয়েছে তা জানি না। কম্প জ্বরের মত সেটা যেদিন আত্মপ্রকাশ করল সেই দিন থেকেই শুরু করি। আগেই একটা কথা বলে রাখছি গল্পটা ঠিক আধুনিক যুগের গল্প নয়। পৌরাণিক গন্ধ আছে। তবে পৌরাণিক গন্ধ থাকলেও এ যুগের সঙ্গে মিলও আছে প্রচুর। যুগে যুগে মানুষের বাইরের চেহারাটাই বদলায়—ভিতরটা বিশেষ বদলায় না। সেকালের রাগী মানুষ আর একালের রাগী মানুষে বিশেষ তফাত নেই। সেকালের দিলদরিয়া ভদ্রলোক একালের দিলদরিয়া ভদ্রলোকের মতই। তারা কি ভাষায় কথা বলতেন ঠিক জানি না। তাই আমাদের ভাষাই তাদের মুখে দিচ্ছি। বেমানান হবে না, কারণ আগেই বলেছি, যে ভাবকে ভাষার দ্বারা আমরা প্রকাশ করি, সে ভাব আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। মানুষের মন বদলায় নি। এবার গল্পটা শুরু করি।

সেদিন রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—যে লক্ষ্মীপেঁচাটা রোজ রত্নাকরের বাগানে ডেকে ওঠে—সে ডেকে সেদিন চলে গেছে। রত্নাকরের স্ত্রী তাপ্তি রত্নাকরের পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। রত্নাকর হঠাৎ তাকে উঠিয়ে দিলে ধাক্কা দিয়ে। ঘুম ভেঙে গেল তাপ্তির।

"কি বলছ ?"

"গন্ধ পাচ্ছ ?"

"কিসের গন্ধ ?"

"কলার ?"

"কলার ?"

আগুনের ফুলকি ছুটল তাপ্তির চোখ থেকে।

"ফল্গু তার বাগান থেকে যে কলার কাঁদিটা পাঠিয়েছিল সেটা তো পাশের ঘরে টাঙিয়ে রেখেছে। সেটা পাকল বোধহয়। ফল্গু বলেছিল পাকলেই গন্ধ ছাড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গেই খেয়ে দেখো। তখন যে স্বাদ পাবে, অন্য সময় পাবে না। নিয়ে এসো না কয়েকটা—"

মিনতির সুর ফুটল রত্নাকরের কণ্ঠে।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি।" উঠে বসল তাপ্তি। রত্নাকরের মুখে মৃদু হাসি।

"ফল্গুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে পাকবামাত্র খাব। আমার কথার খেলাপ কখনও হয় না। তুমি যদি না এনে দাও আমি উঠছি—"

রত্নাকর উঠে বসল।

অপূর্ব সুন্দর চেহারা তার। গোঁফ না থাকলে মেয়েমানুষ বলে ভ্রম হয়।

হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলেছি। এখানেই বলে' রাখি। এ গল্পের নায়ক-নায়িকারা যদিও সবাই যুবক-যুবতী কিন্তু কারও ছেলে-পিলে নেই। নায়িকাদের মধ্যে কুমারী বিধবা সধবা সব রকমই আছে। আর যে রাজ্যে তারা বাস করে তার নাম বাংলা, বিহার, আসাম বা উড়িষ্যা নয়। দেবতার নাম। ওদের দেশের নাম ছিল মহেশ্বর। সে দেশে প্রত্যেক গ্রামে নগরে মহেশ্বরের মন্দির। প্রত্যেক লোক মহেশ্বরের কাছেই নিজের দুঃখ বেদনা কামনা বাসনা নিবেদন

করে। মহেশ্বরের দ্বারে ধর্না দেয় অনেকে। প্রত্যাদেশও পায়। প্রতিদিনই কোনও না কোন সময়ে সবাই মন্দিরে গিয়ে গোপনে জানায় তাদের প্রার্থনা। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, অপূর্ব সুন্দর চেহারা রত্নাকরের। খুব বড় লোকও সে। দেশ-বিদেশে নানা রকম ব্যবসা করে। চাল, চিনি, মশলা, সোনা, রূপো, হীরে, জহরতের। আরও কত কি। মনও তার খুব উঁচু। তাপ্তি তাকে পুজো করে মনে মনে।

রত্নাকরের জেদ দেখে তাপ্তি তার মুখেব দিকে চেয়ে হেসে ফেলল।

"এত রাত্রে কলা খেতেই হবে?"

"হ্যাঁ, ফল্গুকে কথা দিয়েছি। পুরুষের কথা আর হাতির দাঁত অনড়।"

"বাবা বাবা বাবা। কি জেদি লোক—" তাপ্তি উঠে পড়ল।

"কটা আনব? একটু আগেই তো ভাত খেয়েছ—"

"এক ছড়া আন না, দুজনে মিলে খাওয়া যাক।"

"আমি খাব না।"

মুচকি হাসল রত্নাকর। বলল—"তোমাকে যখন বিয়ে করেছিলাম, তখন তুমি ছিলে তন্বী শ্যামা। এখন মোটা হয়ে যাচ্ছ। তাই খাওয়া কমাতে চাইছ নাকি? খাওয়া কমিয়ে কিছু হবে না, পুকুর থেকে ঘড়া ঘড়া জল নিয়ে এসো, বাসন মাজো, ঘর মোছো। খাওয়া কমিয়ে কেউ রোগা হয় না। দুর্বল হয়। দেখ না, ওপাড়ার বাচ্চুকে, বেচারি কিছু খায় না। অথচ হু হু করে মুটিয়ে যাচ্ছে—"

"যত বক্তৃতাই দাও, আমি তোমার ফল্গুর কলা খাব না—"

তাপ্তি বেরিয়ে গেল। একটু পরে তিন ছড়া পাকা কলা নিয়ে ফিরে এল সে।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রত্নাকরের মুখ। "কলার কি রূপ দেখেছো! যেন সোনা দিয়ে তৈরী।"

"সবগুলো খাবে না কি।"

"রাখ তো আগে—"

একটি ছোট সুদৃশ্য ঝুড়ি করে কলা এনেছিল তাপ্তি। সেটি বিছানার উপর রেখে পাশের ঘরে চলে গেল সে।

রত্নাকর একটি কলা ছাড়িয়ে কামড় দিয়ে বলে উঠল—"বাঃ, এ যে জমানো ক্ষীর দেখছি—"

একে একে সমস্ত কলাগুলিই খেয়ে ফেলল সে। খেতে খেতে ফল্গুর কথা মনে পড়ল তার। ছিপছিপে রোগা আশ্চর্য মেয়ে ফল্গু। কথা-বার্তা বেশী বলে না। কিন্তু তার চোখ দুটি দেখে মনে হয়, সর্বদা সে যেন অন্তঃসলিলা বইছে। ভ্রূর সামান্য ভঙ্গীতে, চোখের পাতার সামান্য কম্পনে, মুখের মৃদু হাসিতে সে নিজেকে প্রকাশ করে। রত্নাকরের বন্ধু সুবলীশঙ্কর ব্যবসায় উপলক্ষে যখন বালী সুমাত্রা গিয়েছিল তখন কিনে এনেছিল মাতৃপিতৃহীনা বালিকা ফল্গুকে কোথাকার এক হাট থেকে। নিঃসন্তান সুবলী ওকে কন্যাবৎ পালনও করেছে, তার বিশাল সম্পত্তির অধিকারিণীও করে গেছে ফল্গুকে। ফল্গু বিয়ে করে নি। তার বাগানের শখ। কত রকম গাছই যে লাগিয়েছে সে তার বাগানে। লবঙ্গর গাছ, গোলমরিচের গাছ, চন্দনের গাছ এসব তো আছেই তার বাগানে, নানা রকম নামহীন বন্য গাছগাছড়াও আছে। একটা গাছ আছে দিনের বেলা তাতে সোনালি ফুল ফোটে। সেই ফুলই রাতের বেলা রূপোলি হয়ে যায়। জ্যোৎস্নার ছোঁয়া লাগলে আতরের গন্ধ বেরোয়। ঝাঁপড়ালো অনেক গাছে সে ছোট ছোট ঘর বানিয়েছে গাছের উপর। মাঝে মাঝে শোয় সেখানে। বাগানে কখন যে কোথায় থাকে তা ভিনটু ছাড়া আর কেউ জানে না। ভিনটুও জানে না অনেক সময়। ভিনটু বিশাল-কায়া, অনেকটা রাক্ষসীর মত দেখতে। গায়ে জোরও খুব। সেই ফল্গুকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। প্রবল প্রতাপ তার। ফল্গু খেতে আপত্তি করলে জোর করে তার ঘাড় ধরে মুখে ভাত গুঁজে দেয়। প্রায়ই দেখা যায় ফল্গু হরিণীর মতো ছুটে পালাচ্ছে আর ভিনটু তার পিছু পিছু ছুটছে। কিন্তু রাত্রে ভিনটুর কোলে মাথা রেখে না শুলে ঘুম আসে না ফল্গুর।

ভিনটু দিনেও ফল্গুকে সর্বদা আগলে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না। মেয়েটার এমন স্বভাব, কেমন যেন ফস্‌কে ফস্‌কে পালিয়ে যায়। বিরাট বাগানের গাছ-পালার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। বাগানের মালীরা সংখ্যায় অনেক—তারাও বলতে পারে না ফল্গু বাগানের কোনখানে আছে। কিংবা বাগানে আছে কি না। তবে ভিনটু জানে রাত্রে সে ফিরে আসবেই। তার কোলে মাথা না রাখলে ঘুম আসবে না তার। ছোট খুকীর মত গান গেয়ে মাথা চাপড়ে ঘুম পাড়াতে হয় তাকে। তবু ভিনটুর ওকে নিয়ে স্বস্তি নেই। মেয়েটা কোথায় যেন চলে যায় মনে মনে--কি যে ভাবে সর্বদা—কোন আকাশে যে ভেসে বেড়ায় তা ধরতে পারে না সে। এ সব রত্নাকর ভিনটুর মুখেই শুনেছে। সুবলীশঙ্কর যখন বিদেশে যেতেন, যখন ফল্গুকে বিদেশের হাট থেকে কিনে আনেন, তখন রত্নাকরের বয়স পঁচিশ। ফল্গুর বয়স তখন দশ। মেয়েটা লতার মত তরতর করে বেড়ে উঠল তার চোখের সামনে। সুবলী মারা যাওয়ার পর যখন সে বিষয়ের মালিক হল তখন সে বৈষয়িক সব কাগজ-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল তার কাছে। বলেছিল—"আপনি বাবার বন্ধু ছিলেন। আপনিই এগুলো রেখে দিন। আমার যখন যা দরকার হবে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব।" সে কিন্তু কোনদিন টাকা চাইতে আসে নি। ভিনটুটা মাঝে মাঝে এসে টাকা-কড়ি নিয়ে যায়। সুবলীর ব্যবসা এখন রত্নাকরই দেখে। যা লাভ হয় ফল্গুর নামে জমা করে দেয়। ফল্গুর ব্যবসার দিকে মন নেই। কোনও খবরও নেয় না। মাঝে মাঝে মেঘের মত হঠাৎ আসে, ঘুরে ফিরে আবার চলে যায়। বাগানে ভালো ফল বা ফুল হলে নিয়ে আসে। ফল্গুর কথা ভাবতে ভাবতে রত্নাকরের মনে হোল—তাপ্তি এখনও আসছে না কেন? উঠে পাশের ঘরে গেল। গিয়ে দেখল, তাপ্তি বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে' ফুলে' কাঁদছে। রত্নাকর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে একটি

হাত-পাখা নিয়ে এসে তাপ্তির মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করতে লাগল তাকে।

ফল হল। তাপ্তি হঠাৎ তার হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠল—"আর সোহাগ জানাতে হবে না। পুরুষ জাতটাই নিষ্ঠুর—"

রত্নাকর কোনও জবাব দিল না এর। আত্মপক্ষ সমর্থন করল না। একটু পরে বলল—"দূর দেশে এবার সমুদ্র যাত্রা করব। একটা ভিন্ন মহাদেশে যাব। সেখানে অনেক গজদন্তের সন্ধান পেয়েছি। সে দেশে প্রচুর হাতী। ফিরতে অনেকদিন লেগে যাবে। তাই ভাবছি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমাদের জাহাজ নৌকো তো অনেক থাকবে, তার সঙ্গে আমাদের ময়ূরপংখীটাও নিয়ে যাব। আমরা আলাদা থাকব তাতে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তাপ্তি!

"সত্যি?"

"সত্যি।"

তাপ্তির চোখে-মুখে এমন একটা ভাব ফুটল যা অবর্ণনীয়। সে বলতে লাগল "সত্যি, চল আমরা এখান থেকে দূরে চলে যাই। ওই ফল্গু, নর্মদা, গঙ্গা, যমুনা, মন্দাকিনী, বিতস্তা, ইরাবতী, ভোগবতী, ব্রাহ্মণীরা দিনরাত তোমার কাছে আসা যাওয়া করে—ভালো লাগে না আমার। অথচ ওদের বলা যায় না কিছু। পালাই চল এখান থেকে—"

"বেশ তাই চল—অম্বুধিকে একটা শুভ দিন দেখতে বলি।"

"অম্বুধিকে বোলো না যেন কোথা যাবে। আমরা ময়ুরপংখী নিয়ে যাচ্ছি শুনলেই অম্বুর বউ ইরাবতী আর ধিঙ্গী শালী কাবেরী যেতে চাইবে—"

"না, না, কোথা যাচ্ছি কিছু বলব না। শুধু বলব একটা শুভ দিন দেখে দাও—। চল, এখন শোবে চল।"

দুজনে গিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যা ঘটল তাতে পণ্ড হয়ে গেল সব। পেট ব্যথা করতে লাগল রত্নাকরের। প্রথমে একটু একটু; তারপর ভয়ানক। তাপ্তি বলল—"কলা পেটে গিয়ে ছুরির ফলা হয়েছে। দাঁড়াও একটু সেঁক দিয়ে দি—।"

অত রাত্রে উনুন জ্বেলে জল গরম করে' অনেক কাণ্ড করলে সে। কোনও ফল হল না। ব্যথার চোটে চীৎকার করতে লাগল রত্নাকর।

তাপ্তিও হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বাড়ির চাকরাণী পদ্মাও এসে কাঁদতে বসে গেল বিছানার কাছে এসে। কাঁদতে কাঁদতে বলল—"মা কালীর মন্ত্র-পড়া তেল আছে, সেটা মালিশ করে দেবো ?" তাপ্তি বলল—"নিয়ে আয় আমি মালিশ করে দিচ্ছি—"

পদ্মা বলল—"আমি ছাড়া আর কেউ মালিশ করলে ফল ফলবে না—"

"তোকে মালিশ করতে হবে না। তুই কবরেজ মশাইকে খবর দে। উমাচরণকে বল গাড়ী নিয়ে যাক—"

পদ্মা উঠে গেল। পদ্মা তাপ্তির বাপের বাড়ির ঝি। যদিও কালো, তবু কিন্তু রূপসী সে। এবং যুবতীও। কালো পাথরে কোঁদা অজন্তার মূর্তি যেন একটি। তাপ্তি তাকে রত্নাকরের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। পদ্মা কিন্তু কোন-না-কোন ছুতোয় আসার চেষ্টা করে।

॥ ২ ॥

জলধি কবিরাজ লম্বা শুঁটকো, তিরিক্ষি মেজাজের লোক। তার বৈশিষ্ট্য কেউ তাকে ডাকতে এলেই বলে, যাব না। যারা তার বাড়িতে চিকিৎসার জন্য আসে, তাদেরও গালাগালি দিয়ে বলে— "তোরা পাপী, তোদের মা-বাবারাও পাপী—তাই অসুখে পড়েছিস। আমি কি করব। যা পালা এখান থেকে।"

জলধি কবিরাজ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কিন্তু সত্যিই পারঙ্গম পণ্ডিত ব্যক্তি। চিকিৎসা করে টাকা নেয় না, ওষুধও বিনামূল্যে দেয়। তার সংসার চলে চাষ থেকে। প্রচুর জমির মালিক জলধি শর্মা। কবিরাজী গাছগাছড়ারও প্রকাণ্ড বাগান আছে। নানা রকম দুর্লভ গাছগাছড়া লাগিয়েছে সেখানে। এই সব গাছগাছড়া সংগ্রহের জন্য অনেক সময় বিদেশেও গিয়েছে। আসল শিলাজতু সংগ্রহের জন্য হিমালয়েও গিয়েছিল। রত্নাকরের বাণিজ্যপোতে চড়ে' অনেক দ্বীপেও ভ্রমণ করেছে সে। প্রকৃতই পণ্ডিত লোক জলধি। কিন্তু অত্যন্ত খিটখিটে। সমস্তক্ষণ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র আর ওষুধের খুঁটিনাটি নিয়েই ব্যস্ত। বাধা পড়লেই ক্ষেপে যায়। সে সুশ্রুতের একটা গ্রন্থ মনোনিবেশ সহকারে পড়ছিল, এমন সময় তার স্ত্রী নর্মদা এসে প্রবেশ করল। তার কাপড় গাছ-কোমর করে' পরা, নাকের উপরও একটা গামছা বাঁধা। হাতে একটি মুষল। সে পাশের ঘরে উদুখলে গোলমরিচ কুটছিল। জলধির বিশ্বাস স্ত্রীলোকদের সর্বদা কাজে নিযুক্ত না রাখলে তাদের মন উড়ুউড়ু করে এবং শেষকালে তারা যা করে তা কাজ নয়, অকাজ। জলধি নিজে বাড়িতে ওষুধ তৈরি করে এবং নর্মদাকে সেই সব ব্যাপারে নিযুক্ত রাখে। একালের মেয়ে হ'লে বিদ্রোহ করত, পালিয়ে যেত, কিন্তু

সেকালের মেয়েরা ভাবতেও পারত না এসব। নর্মদা এসে বলল—"রত্নাকরের খুব অসুখ করেছে। গাড়ী এসেছে তার বাড়ি থেকে। আর পদ্মাও এসেছে। সে কান্নাকাটি করছে খুব। রত্নাকর নাকি খুব কষ্ট পাচ্ছে। তুমি গিয়ে দেখে এস একবার—।"

জলধি বলল—"বলে' দাও যাব না। রত্নাকরের অসুখ তো হবেই। ওর পিছু পিছু পাল পাল মেয়ে মানুষ ঘুরছে সর্বদা। মহাপাপী ও—।"

নর্মদারও দুর্বলতা ছিল রত্নাকর সম্বন্ধে। কাণ দুটো লাল হয়ে উঠল। সে বলল—"পাপী তো তোমার চোখে সব্বাই। ওর মত উপকারী বন্ধু আমাদের কিন্তু আর কেউ নেই। তোমার ওষুধ দেশ-বিদেশ থেকে ওই এনে দেয়। ওর নৌকোয় চড়ে' তুমিও কত জায়গায় গেছ—"

হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে চীৎকার করে' উঠলেন জলধি—"যাব যাব যাব যাব যাব—তুমি একটু থামো দিকি।"

রত্নাকরের বাড়িতে গিয়ে জলধি দেখল তার শোবার ঘরে একগাদা মেয়ে মানুষ কিলবিল করছে। কাঁদছে অনেকে, কান্নার ভাণ করছে কেউ কেউ। তাপ্তি স্বামীর মাথা কোলে করে বসে আছে বিছানায়। তার চোখে ধারা নেমেছে। আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল জলধির। বলে উঠল—"কি কাণ্ড। এত ভীড় কেন? হাটের মধ্যে কি রুগী দেখা যায়। এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাও সবাই।"

একে একে সবাই বেরিয়ে গেল।

তাপ্তি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—"আমিও যাব কি?"

"তুমিও যাও।"

তাপ্তি বেরিয়ে গেল। রত্নাকর চোখ বুজে শুয়েছিল। সবাই চলে যাবার পর সে চাইলে জলধির দিকে।

"তোমার পেটের কোনখানটায় ব্যথা?"

রত্নাকর বাঁ দিকে বুকের একটু নীচে হাত দিয়ে দেখালে।

"যে জায়গাটা দেখাচ্ছ সেটা তো হৃদয়ের স্থান। হৃদয়-বেদনায় ভুগছ নাকি ?"

মৃদু হাসল রত্নাকর। উত্তর দিল না।

"জিভ দেখাও।"

রত্নাকর জিভ দেখাল।

"জিভ তো পরিষ্কার। দাও নাড়ীটা দেখি—।"

নাড়ী ধরে চোখ বুজে এক ঘণ্টা বসে রইল জলধি। ভ্রূ কখনও কুঞ্চিত হচ্ছে, কখনও মসৃণ হয়ে আসছে। নাসারন্ধ্র কখনও বিস্ফারিত হচ্ছে, কখনও হচ্ছে না।

এক ঘণ্টা পরে নাড়ী ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন—"ও ব্যথা কলার নয়, কলা তোমার হজম হয়ে গেছে। কিন্তু নাড়ী থেকে বুঝলাম তোমার বায়ু প্রকুপিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাগলও হয়ে যেতে পারো। তোমার ও ব্যথা বায়ুর ব্যথা—"

"ওষুধ দেবে ?"

"দেব না। ওর ওষুধ নেই আমাদের ভাণ্ডারে। ওর ওষুধ মহেশ্বর। মন্দিরে গিয়েছিলে ?"

"গিয়েছিলাম। রোজ যাই।"

"ওঁকেই প্রার্থনা কর। মদন-দমন উনিই। আমার মনে হচ্ছে মদনকে কেন্দ্র করেই তোমার মনে কোনও মতলব জেগেছে। তাই বায়ু প্রকুপিত। এর কোনও ওষুধ নেই। একটা তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি পেটে মালিশ কর, কিছুটা উপশম হবে কিন্তু সারবে না।"

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নর্মদা ঘরে ঢুকল। জলধি লক্ষ্য করলেন বর্মা থেকে অদ্ভুত যে দুলজোড়া রত্নাকর এনে নর্মদাকে দিয়েছিল সেই দুলজোড়া পরেই এসেছে সে। সে এসেই জলধিকে বলল—"তুমি শীগ্‌গির বাড়ি যাও। অব্ধি আর ভোগবতী আবার মারামারি করে

রক্তারক্তি কাণ্ড করেছে। ভোগবতী অহ্নির গালে কামড়ে দিয়েছে। আর অহ্নি ঘুষি মেরেছে তার চোয়ালে—যাও শীগ্‌গির তুমি—"

জলধি চেঁচিয়ে উঠল—"ওরা মরুক। আমি যাব না—।"

"ওরা মরবে না। ওরা অমর। ভোগবতী সাতাশটা সতীনকে তাড়িয়েছে। ও একাই ভোগ করবে স্বামীকে। আর অহ্নি কিছুতেই ওর দিকে মন দেবে না—নিজের মন্ত্র তন্ত্র নিয়ে দিনরাত আছে। ভোগবতী কাছে এলেই চুলের ঝুঁটি ধরে হিড়হিড় করে বের করে দেয় ঘর থেকে। দুজনের গায়েই অসুরের মত শক্তি।"

জলধি চেঁচিয়ে উঠল—"ওসব পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটছ কেন? ওসব তো আমি জানি। পৃথিবীতে কেউ অমর নেই। রাবণ বীরবাহুরাও মারা গেছে—। ওরাও মরবে। আমি বলছি, প্রার্থনা করছি—শীগ্‌গির মরুক।"

"কিন্তু অহ্নির মত গুণী যদি মরে যায় তোমার যে ডান হাত ভেঙে যাবে। গাছ, পালা, শিকড়, বাকড়, ফুল, ফল, তামা, পারদ, লোহা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা একনজরে দেখে বলে দেবার মতো লোক আর আছে কি এদেশে? আর ভোগবতী না বাঁচলে অহ্নি দেশান্তরী হবে, ওরা মারপিট করে বটে, কিন্তু ওরা পরস্পরকে ভালোবাসে খুব। একদণ্ড কেউ কারও চোখের আড়াল হ'তে চায় না। তুমি যাও।"

জলধি মুখ গোঁজ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর উঠে চলে গেল।

॥ ৩ ॥

জলধি বাড়ি ফিরে দেখল অদ্ধি ভোগবতী চলে গেছে। তার চাকর কৈলাস বলল—"তারা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে একটা বন-তুলসীর গাছ উপড়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন।"

"তাই নাকি।"

হাঁ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জলধি। তারপর জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলে যে বনতুলসী গাছটা সে বাড়ির উঠোনেই লাগিয়েছিল সেইটেই তুলে নিয়ে গেছে। জলধির হাঁ বন্ধ হয়ে গেল। দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। বলল—"পাপ পাপ পাপ।" তারপর হন হন করে বেরিয়ে গেল সে। অদ্ধির বাড়ির দিকেই গেল। অদ্ধির বাড়ি বেশী দূর নয়—পাশেই। সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে গেল জলধি। দেখল অদ্ধি আর ভোগবতী দুজনেই মাথায় মুখে ন্যাকড়ার ফেট্টি বেঁধে পাশাপাশি বসে চুমুক দিয়ে গরম দুধ খাচ্ছে। দুজনেরই মুখে হাসি। জলধিকে দেখে অদ্ধি বলে উঠল—"আমরা আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনাকে পেলাম না। উঠোনে দেখলাম একটা বনতুলসী গাছ রয়েছে। সেইটি উপড়ে নিয়ে এলাম। তার পাতা কয়েকটা চিবিয়ে লাগিয়ে দিলাম ভোগলুর ঘায়ে। তারপর ভোগলু কয়েকটা পাতা চিবিয়ে আমার গালে লাগিয়ে দিলে। তারপর পুরোনো ন্যাকড়া ছিঁড়ে আমি ওকে ফেট্টি বেঁধে দিলাম, ও আমাকে ফেট্টি বেঁধে দিলে। ঠিক করি নি? হ্যাঁ, আপনাকে দুটো দরকারি কথা বলতে হবে। আপনার ঘরে ঢুকেই অনুভব করলাম ঘরে একটা গোখরো সাপ ঢুকেছে। তার গায়ের গন্ধ পেলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না কোথাও। কোনও গর্তে টর্তে ঢুকে আছে বোধহয়। ঘরে গিয়ে খুব ধুনো জ্বালাবেন, পালাবে। সসর্পে গৃহে বাস ঠিক

নয়। ঘরের কোণে একটা বড় খল দেখলাম। নতুন কিনেছেন নাকি ?”

“হ্যাঁ,”—জলধি বলল—“খলে তোমার নজর পড়ল কেন ?”

“কেন তা যদি বলি তাহলে ওটাকে আর খল রূপে ব্যবহার করবেন না আপনি। ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন—।”

“তার মানে—?”

“যেই শুনবেন ওর তলায় একটা দামী হীরে আছে অমনি আপনি ওটা ভেঙে হীরেটা বার করে নেবেন। নেওয়া উচিত। খলটা দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল, তারপর ছুঁয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি। ছোট একটা হীরে আছে ওর তলার দিকে—”

“ওখানে হীরে কি করে আসবে ?”

“আসবার অনেক পথ আছে। কোন পথে এসেছে তা ভোগলু হয়তো বলতে পারবে। ও খড়ি পেতে গুনতে পারে—।”

ভোগবতী গুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলে অব্ধির পিঠে।

“তুমি সবাই-এর সামনে আমাকে ভোগলু বলে ডাকবে না—।”

“ভোগবতী নামটা বড্ড বড়—।”

“আমিও তাহলে তোমাকে বলব অবু। অবু, অবু, অবাই—” বলে মুখ ভেংচে পালিয়ে গেল ভোগবতী।

“কি রকম পাজি দেখেছেন ? সাধে ওকে মারি ?”

তারপর গলার স্বর নাবিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে—“আর একটা গোপন কথা আপনাকে বলছি। আমাদের মন্দিরে দেবতারা গোপনে আনাগোনা শুরু করেছেন। একদিন ইন্দ্রকে দেখলাম, আর একদিন পবনকে। দৈত্যরাও আসছে। ওদের আকৃতি দেখেই বোঝা যায়। একদিন দেখলাম প্রকাণ্ড একটা দৈত্য হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের মন্দিরে ঢুকছে—।”

“তুমি দেখলে ?”

“হ্যাঁ।”

"কখন ?"

"রাত্রে। ব্রাহ্মমুহূর্তে—।"

"তখন তুমি জেগে থাকো নাকি—?"

"তখনই তো জেগে থাকি। আমি আর ভোগলু দুজনেই তখন জেগে থাকি।"

"কি কর ?"

হা হা করে হেসে উঠল অব্ধি।

"সেটি বলব না। যা করি তার জোরেই তো বলতে পারলাম আপনার ঘরে সাপ ঢুকেছে, আপনার খলের ভিতর হীরে আছে—আপনি এবার বাড়ি যান—বনতুলসীর পাতাতেই আমাদের ঘা সেরে যাবে—যদি না সারে আবার যাব আপনার কাছে। দেখি ভোগলু কোথা গেল। আমি চললুম। ওকে ধরে আনি—।"

জলধি বলল—"তোমাকে আমি আর ওষুধ দেব না।"—বলেই হনহন করে চলে গেল জলধি। চীৎকার করে জবাব দিল অব্ধি—"দেবেন, দেবেন আমি জানি নিশ্চয়ই দেবেন।"

অব্ধি লোকটা যে কি তা কেউ জানে না। কেউ বলে যাদুকর, কেউ বলে পিশাচ-সিদ্ধ। আবার কেউ বলে ও নাকি তান্ত্রিক আর ভোগবতী নাকি ওর উত্তরসাধিকা। ভোগবতী আসার আগে সাতাশটি যুবতীকে একে একে বিয়ে করেছিল নাকি অব্ধি। কিন্তু কেউ ওর মনোমত উত্তরসাধিকা হয় নি। তারপর ভোগবতীকে বিয়ে করল। ভোগবতী পাহাড়ী জংলি মেয়ে, দুর্দাম উদ্দাম। কিন্তু উত্তরসাধিকা হিসাবে নাকি প্রথম শ্রেণীর। অব্ধির জীবনে ভোগবতীই এখন একেশ্বরী। ওর আগেকার সাতাশটি স্ত্রী ওর প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে চলে গেছে।

## ॥ ৪ ॥

রত্নাকর এখনও পেটের ব্যথায় কাতর। জলধি কবিরাজের তেল মালিশ করে কিছু হল না। মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল তাপ্তি। তার সন্দেহ হল ফল্গুর বাগানের কলা, হয়তো কলার ভিতর দিয়ে কোনও রকম গুনটুন করেছে মেয়েটা। কথা কয় না, মাঝে মাঝে আসে আর মুচকি মুচকি হাসে, কি যে ওর মনে আছে ভগবানই জানেন। তাপ্তি ঠিক করলে অব্ধিও তো একজন গুণী লোক, তাকে কলাগুলো দেখাবে। সে হয়ত বলে দিতে পারবে কলার ভিতর কোনও মন্ত্রটন্ত্র পড়ে দিয়েছে কিনা। তাপ্তির ধারণা নিশ্চয় মন্ত্র আছে। কারণ রত্নাকর কলা খাওয়ার পর থেকেই বার বার ফল্গুর কথা বলছে। ফল্গু কিন্তু আসে নি। তাকে রত্নাকর ডাকতেও পাঠিয়েছিল একবার—তবু আসে নি। দেখা পায় নি তার। তাপ্তির ভয়, দূর থেকে মেয়েটা কি যে করছে—ধরবার উপায় নেই।

কলার কাঁদিটা প্রকাণ্ড। সব কলাই প্রায় পেকে গেছে। গন্ধে চারদিকে ম ম করছে। তাপ্তির নিজের মনটাও কেমন যেন লোভাতুর হয়ে উঠেছে। তবুও সে একটা কলাও খায় নি। কিন্তু চিন্তা হচ্ছে খুব। যে কলার এমন মনমাতানো গন্ধ, সে কলা খেলে না জানি কি হবে। কবিরাজমশাই বলেছেন—শরীরে কোন ব্যাধি নেই। ব্যাধি মনে। বায়ু প্রকুপিত। এসব শুনে খুবই ঘাবড়ে গেছে তাপ্তি। এক ছড়া কলা নিয়ে সে হাজির হোল অব্ধির বাড়ি। বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল কপাট বন্ধ। মনে হোল বাড়িতে কেউ নেই। অনেক ডাকাডাকি করতে তাদের চাকর আমন বেরিয়ে এল।

"মা বাড়িতে আছেন ?"

"আছেন। আসুন আপনি—"

"বাবা?"

"বাবাও আছেন। আসুন আপনি—" আমন তাপ্তিকে ভিতরে নিয়ে গেল।

আমন তাপ্তিকে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললে—"আপনি বসুন এখানে। আমি মাকে খবর দি—" তাপ্তি বসল না, ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখতে লাগল। কোথাও নানা রঙের পাথরের নুড়ি, কোথাও বা শিকড়, কোথাও হাড়। নানারকম জানোয়ারের খুলিও রয়েছে এক জায়গায়। মানুষের খুলিটা ভয়ঙ্কর। খালি চোখ দুটো যেন গিলতে আসছে। আর এক জায়গায় সাপের খোলস টাঙানো রয়েছে। ভয় করতে লাগল তাপ্তির। কিন্তু বেশীক্ষণ তাকে সে ঘরে থাকতে হল না। আমন ফিরে এসে বলল, "চলুন, মা আপনাকে ভিতরে যেতে বললেন—"

ভিতরে গিয়ে তাপ্তি দেখল ভোগবতী গায়ে মুখে ছাই মাখছে।

"একি! কি মাখছ?"

"ছাই মাখছি, মড়ার ছাই।" তাপ্তি অবাক হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

ভোগবতী বলল—"তোমার গা ঘিন ঘিন করছে না? আমি যে নাটকে অভিনয় করি সে নাটকে এই সবই বেশভূষা। কখনও কখনও উলঙ্গিনীও হতে হয়। তোমার হাতে কলা কেন?"

"এই কলা ফল্গু আমাদের পাঠিয়েছিল তার বাগান থেকে। উনি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেটে ভীষণ ব্যথা। এখনও সারে নি। কবরেজমশাই বললেন—কলা হজম হয়ে গেছে। তাই এঁকে দেখাতে এনেছি কলায় কোনও দোষ নেই তো—উনিই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন—"

"উনি এখন পাশের ঘরে শীর্ষাসন করছেন। কলাটা রেখে যাও। ওঁর মতামত ওঁকে দিয়ে একটা কাগজে লিখিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

বলেই হো হো করে হেসে উঠল ভোগবতী। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল—"শোন তাপ্তি—স্বামীকে আগলে আগলে রাখা যায় না। ওরা হাওয়ার মত। স্ত্রীর চারদিকেও ঘুরবে, পরস্ত্রীর চারদিকেও ঘুরবে। তারপর সব তো এই হবে—।"

এই বলে এক মুঠো ছাই নিয়ে আবার সে গায়ে মাখতে শুরু করল।

তাপ্তির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। সে কিন্তু মুচকি হেসে বলল—"এখন চলি তাহলে। খবরটা পাঠিয়ে দিও। ওঁকে একলা রেখে এসেছি।" তাপ্তি চলে গেল।

পাশের ঘরে শীর্ষাসন করে উলঙ্গ অগ্নি সূর্যের তপস্যা করছিল। তার মনশ্চক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রদীপ্ত দিবাকর। তাঁকে উদ্দেশ্য করে সে মনে মনে বলছিল—"সমস্ত জ্ঞানের আকর হে জবাকুসুম-সঙ্কাশ, হে জ্যোতির্ময় দেবতা, তুমি আমাদের দেহকে পোষণ কর, মনকে উদ্দীপ্ত কর, অজ্ঞানের অন্ধকার তোমার স্পর্শে বিলুপ্ত হয়, হে মহাজ্যোতিষ্ক শতকোটি প্রণাম তোমাকে। আমার মধ্যে তুমি প্রতিফলিত হও। তোমার কৃপায় যা রহস্যাচ্ছন্ন, যা অস্পষ্ট, যা তমসাবৃত তা আমার কাছে স্বচ্ছ হোক, স্পষ্ট হোক, আত্মপ্রকাশ করুক—তুমি কৃপা কর, কৃপা কর, কৃপা কর।"

অগ্নির এ তপস্যার কথা অগ্নি ছাড়া আর কেউ জানে না। কেবল জানেন মহেশ্বর। তাঁর কাছে প্রত্যহ আর একটি প্রার্থনাও সে করে কিন্তু সে কথা পরে হবে।

তাপ্তি চলে যাবার পরও ভোগবতী কিছুক্ষণ ছাই মাখল। তারপর হাঁক দিল—"আমন শ্বেত পাথরের কলসীটা আর দুটো বাটি নিয়ে আয়।" তারপর উঠোনে বেরিয়ে দেখল সূর্য মধ্যাকাশে উঠেছে কিনা। সূর্য মধ্যাকাশে উঠলেই অগ্নির ধ্যানভঙ্গ হয়। তারপর সে আর অগ্নি খাওয়া-দাওয়া করে। খাওয়া-দাওয়া সেরে

বেরিয়ে যায় শ্মশান-মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে। প্রায় এক ক্রোশ হাঁটতে হয়। সেখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। রাত্রিটা ওখানেই কাটায় তারা। খুব ভোরে আবার বাড়ির দিকে যাত্রা করে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাড়ি ফেরে। বাড়ি ফিরে স্নান করে তারা নিজেদের পুকুরে। হুড়োহুড়ি করে' সাঁতার কাটে দু'জনে। তারপর শীর্ষাসন করে অগ্নি ধ্যান শুরু করে। আর মনে মনে মন্ত্র জপতে জপতে ভোগবতী সাজ-সজ্জা করে। কোনদিন ছাই মাখে, কোনদিন হাড়ের গয়না পরে। কোনদিন কিছুই পরে না, শুয়ে ঘুমোয়।

উঠোন থেকে ফিরে এসে ভোগবতী দেখলে আমন শ্বেত পাথরের কলসী আর দুটি শ্বেত পাথরের বাটি এনেছে। তার পিছনে পিছনে তাদের রাঁধুনী মিশরি ঢুকল দুট প্রকাণ্ড থালা নিয়ে। শ্বেত পাথরের কলসীটি অনেকটা বোতলের মত দেখতে।

মিশরি প্রকাণ্ড থালা দুটি রেখে—আবার একটা বড় বাটি নিয়ে এল। বেশ বড় জামবাটি একটা। ভোগবতী প্রশ্ন করল—"আজ কি খাবার করেছিস আমাদের জন্য?"

"একটা বড় চিতল মাছ, তার পেটিগুলো ভেজেছি আপনাদের জন্য। আর ব্যাধ ভৈরব চারটে কালো তিত্তির পাখী দিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো মশলা মাখিয়ে আগুনে ঝলসেছি। তাছাড়া ক্ষীরও আছে একবাটি।" এই সময় অগ্নি এসে ঘরে ঢুকল।

"বাঃ, প্রচুর খাবার দেখছি আজ। ভৈরব তিত্তির দিয়ে গেছে বুঝি। ওকে একটা লোহার টুকরো দিয়েছিলাম। বলেছিলাম এটা দিয়ে তীরের ফলা তৈরি করিয়ে নিস। যাকে লক্ষ্য করবি অব্যর্থ লাগবে। ভৈরব বলেছিল এ দিয়ে যা মারব আপনাকে তার ভাগ দেব—তিত্তিরগুলো বেশ বড় বড় দেখছি—"

ভোগবতী বলল—"তাছাড়া কলা আছে।"

"কলা কোথা থেকে এল?"

"তাপ্তি দিয়ে গেছে।"

"কেন ?"

তখন ভোগবতী সব খুলে বললে অব্ধিকে। অব্ধি কলাগুলো নিয়ে শুঁকল। তারপর খেল একটা।

"বাঃ, এ তো চমৎকার।"

আর একটা খেল।

ফোঁস করে উঠল ভোগবতী, "বা রে—তুমি একাই সব খাবে নাকি ? আমাকে দাও—।"

কলা নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল দুজনে। হয়তো এ নিয়ে মারামারি হ'ত কিন্তু বাইরে কবি পারাবারের গলা শোনা গেল। সে গাইতে গাইতে আসছে—

"ডাকলে তুমি দাও না সাড়া
ধরা পড়েও দাও না ধরা
ও মোর মিতা অপরাজিতা
ওগো কৃষ্ণা নীলাম্বরা।
প্রজাপতির পাখায় নাচো
আকাশ ভরে' ছড়িয়ে আছো
নীল-লোহিতের কণ্ঠ-শোভা
ওগো নীলা স্বয়ম্বরা।"

পারাবার এসে ঘরে ঢুকল এবং কবিতায় সম্বোধন করল ভোগবতীকে।

"আজি অসময়ে অতি
ওগো দেবি ভোগবতি,
এসেছি তোমার কাছে ছুটিয়া,
ব্রাহ্মণী রুষ্যমানা
কপালে দিতেছে হানা
শাঁখাটি গিয়াছে তার টুটিয়া।
ছুটিয়া এলাম তব দ্বারে
আর একটি শাঁখা দাও তারে।"

হো হো করে হেসে উঠল অব্ধি আর ভোগবতী দু'জনেই। তারপর বলল—"সাগর শঙ্খ, মুক্তা শঙ্খ, শাদা শঙ্খ, সহজ শঙ্খ,—সব আছে। যেটা ইচ্ছে নিয়ে যাও। কিন্তু তার আগে খাও বঁধু হে, খাও কিছু—"

পারাবারকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল তারা দু'হাত তুলে।

পারাবারের বয়স কত বলা শক্ত। চেহারাটি বালকের মত। চোখ দুটি স্বপ্নময়। মুখে সর্বদাই একটা অপ্রস্তুত ভাব, যেন সে এমন একটা কিছু করে ফেলেছে যা করা অনুচিত। অপ্রস্তুত মুখেই সে কলা খেয়ে ফেলল একটা। তারপর বলল—মনে হচ্ছে এ কলা চৌষট্টি কলার উপর টেক্কা দিয়েছে। কোথা পেলে এ অপূর্ব কলা—?"

"ফল্গুর বাগানের কলা,—"

"ফল্গুর? তাই এত চমৎকার। ফল্গু তো মানুষ নয়। ও একটা সুর।"

"কিসের সুর?"

"তা জানি না। সেতারে, এস্রাজে, বীণায়, বেণুতে, তানপুরায় ও বাজতে পারত। কিন্তু কোন ওস্তাদ আজ পর্যন্ত ওকে কোনও যন্ত্রে ধরতে পারে নি। তাই ও আকাশে বাজে। তোমার সঙ্গে আলাপ আছে?"

"না, ও কারো সঙ্গে আলাপ করে না। ওর বাপের বন্ধু রত্নাকরের বাড়িতে মাঝে মাঝে যায়—।"

"আমি ওকে একদিন একটা কদম গাছের উপরে দেখেছিলাম। দেখলাম একটা ডালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে, আর ওকে ঘিরে আছে রাশি-রাশি রোমাঞ্চিত কদম ফুল। দূর থেকে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম একটা কবিতা লিখব। অনেক কাগজ নষ্ট করেছি, পারি নি। ওকে কবিতাতেও ধরা যায় না—"

ভোগবতী বলল—"এখনি যে একটা গান গাইতে গাইতে আসছিলেন—কি গান সেটা?"

"আজ আমাকে নীল রংয়ে পেয়েছে। নীল রং মোহের নীলাঞ্জন

পরিয়ে দিয়েছে আমার কল্পনার চোখে। নীলকে নিয়েই গান গাইছি আজ। আর দেরী করব না কিন্তু। শাঁখা দাও আমাকে। ব্রাহ্মণী ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছে। তার ভয় হয়েছে শাঁখা ভেঙ্গে গেলে আমার বুঝি কোনও অমঙ্গল হবে—"

ভোগবতী প্রকাণ্ড একটি কড়ির ঝাঁপি এনে দিল পারাবারকে। "আমার সব শাঁখা ব্রাহ্মণীকেই দিলাম। আমি আজকাল শাঁখা পরি না। হাড়ের গয়না পরি। ব্রাহ্মণী খুব ধর্মভীরু, না?"

"খুব। অর্ণবের কাছে মন্ত্র নিয়েছে। দিনরাত জপ পুজো নিয়েই আছে। আর ত্রিবেণী সঙ্গমে যায় রোজ।"

"ত্রিবেণী সঙ্গম? সে আবার কি?"

"গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী নামে তিনটি মহিলা একটি আশ্রম মতো করেছে। সেখানে কেবল ধর্মচর্চা হয়। ব্রাহ্মণী রোজ যায় সেখানে। ওখানে অর্ণব রোজ বক্তৃতা দেয়। ওরা সবাই অর্ণবকেই মনুষ্যরূপী মহেশ্বর মনে করে।—হ্যাঁ, মহেশ্বরের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল। কাল রাত্রে আমি যখন মহেশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যাচ্ছি তখন দেখলাম দু'জন দিব্যকান্তি যুবক মহেশ্বরের মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, আর দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথা—।"

"তুমি বোধহয় অশ্বিনীকুমারদের দেখেছ। আমি একদিন ইন্দ্রকে দেখেছি। দেবতারা কেন জানি না মহেশ্বরের মন্দিরে যাতায়াত করছেন। দৈত্যরাও করছেন। আমি একদিন দৈত্যও দেখেছি একটা।

"তাই না কি?"

"হ্যাঁ। নেপথ্যে কিছু একটা হচ্ছে বোধ হয়।"

ভোগবতী বলল—"ব্রাহ্মণীর জন্যে দুটো কলা নিয়ে যাও।"

"ফল্গুর বাগানের কলা শুনলে খাবে না। ওরা ফল্গুর উপর ভয়ানক চটা।"

"কেন?"

"ত্রিবেণী সঙ্গমের সবাই ফল্গুর উপর চটা। কারণ ফল্গু রত্নাকরের কাছে যায়।"

"গেলেই বা—"

"ত্রিবেণী সঙ্গমের তিনটি বেণী এবং আমার ব্রাহ্মণী সকলেই রত্নাকরের কৃপাপ্রার্থিনী। ওই আশ্রম রত্নাকরই করিয়ে দিয়েছে। তাঁদের আশা রত্নাকরই তার নৌকোয় চড়িয়ে তাদের কন্যাকুমারিকা তীর্থে নিয়ে যাবে। ফল্গু ওর বাড়িতে আসা যাওয়া করে, এটা ওরা সহ্য করতে পারে না—" ভোগবতী বলল—"আমারও খুব ভালো লাগে রত্নাকরকে। দিলদরিয়া লোক। আমাদেরও ও লঙ্কায় নিয়ে যাবে বলেছে। ওর বউ তাপ্তি কিন্তু ভারি হিংসুটে। খালি সন্দেহ কে ওর স্বামীকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। ফল্গু এই কলা রত্নাকরকে পাঠিয়েছিল, ওর সন্দেহ ফল্গু বুঝি কলার ভিতর কোনও মন্ত্রটন্ত্র পড়ে দিয়েছে—।"

পারাবার বলল—"তাপ্তিকে আমি দোষ দিই না। রত্নাকরের মত স্বামী যার সে তো সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকবেই। শুধু ওর চেহারাই অপূর্ব নয়, মনও অসাধারণ। অগাধ টাকার মালিক কিন্তু কোনরকম স্থূলতা নেই। রসিক লোক রত্নাকর। গানের সমজদার, ছবির সমজদার। অর্ণব শর্মা দিনরাত ধর্ম-শাস্ত্র নিয়ে আছে। কিন্তু রোজগার নেই। ওর সংসার চালায় কে জানো? ওই রত্নাকর। পঁচিশ বিঘে নিষ্কর জমি কিনে দিয়েছে ওকে। তাছাড়া মন্দাকিনী প্রায়ই গিয়ে টাকাকড়ি নিয়ে আসে। অম্বুধি বলেছিল মন্দাকিনীর নাকি মঙ্গল বিরূপ। ভালো প্রবাল পরা দরকার। রত্নাকর চমৎকার একটা প্রবালের মালা উপহার দিয়েছে ওকে। প্রত্যেকটি প্রবাল পায়রার ডিমের মত। রত্নাকর সত্যিই মহৎ লোক। সবাই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং তাপ্তির ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ইস্ বড্ড দেরি হয়ে গেল। চললুম। পরে দেখা হবে।"

কড়ির ঝাঁপিটি নিয়ে বেরিয়ে গেল পারাবার।

৫ ॥

আমন অব্ধির চিঠি দিয়ে গেছে। পড়ে আরও চিন্তিত হয়ে পড়ল তাপ্তি। হলদে ভূর্জপত্রে গোটা গোটা অক্ষরে অব্ধি লিখেছে—"উৎকৃষ্ট মর্তমান কলা। নির্দোষ এবং নির্মল।" তাপ্তির আশা ছিল কলায় যদি কোন দোষ পাওয়া যায় তাহলে তিন্তিড়ীকে দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করাবে। তিন্তিড়ী ঝাড়-ফুঁকে খুব ওস্তাদ। তার ব্যবসা সিদ্ধির আর গাঁজার, কিন্তু অনেক রকম মন্ত্রতন্ত্র জানে সে। বশিষ্ঠ পণ্ডিতের বউকে ভূতে ধরেছিল। দিনরাত গোঁ গোঁ করত। তিন্তিড়ীই তাঁকে সারিয়েছে। অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল তিন্তিড়ী। একটা কালো ষাঁড়ের গোবর শুকিয়ে প্রচুর ঘুঁটে তৈরি করল প্রথমে। তারপর প্রকাণ্ড একটা কালো রঙের মালসা নিয়ে এল মিঠু কুমোরের কাছ থেকে। কালো গাইয়ের দুধ জমিয়ে ঘি তৈরি করলো কালো কড়াইয়ে তমাল কাঠের আগুনে জ্বাল দিয়ে। রান্নাঘরের কালো ঝুল মেশালো তার সঙ্গে। তারপর সেই ঘি দিয়ে কালো মালসায় ঘুঁটেগুলো ধরিয়ে ফেললে আর সেই আগুনে ফেলতে লাগল কালো জিরে, মেথি, গোলমরিচ, কালো বিছে তিনটে, আর কালো গুবরে পোকা। আর মন্ত্র আওড়াতে লাগল জোরে জোরে। তিন্তিড়ীর ঘাড়টা যদিও বেঁকা কিন্তু গলায় জোর খুব। গাঁজা খায় কিনা, বেশ ভরাট গলা। মন্ত্র পড়তে পড়তে ঝামর দিয়ে ঝাড়তে লাগল বশিষ্ঠর বউকে। ভূত ছট্‌ফটিয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু কলাতে যখন দোষ নেই তখন তিন্তিড়ীর কাছে গিয়ে কি হবে।

হঠাৎ তাপ্তির মনে হল—অম্বুধি তো ভালো জ্যোতিষী। সে হয়ত গুণে বলতে পারবে ব্যাপারটা কি। ও না হয় এসে রত্নাকরের হাতটা দেখুক। কিন্তু আবার একটু দ্বিধাও হল। অম্বুধিকে খবর দিলেই

ইরাবতী আর তার বিধবা বোন কাবেরী ছুটে আসবে আগে। ছুটো মেয়েই ঢলানী। রত্নাকরকে ঘিরে এমন সব কাণ্ড করবে যে বাধা দেওয়াও শক্ত, সহ্য করাও শক্ত। ইরাবতীও স্বামীর কাছে গুণতে শিখেছে একটু-আধটু। আর কাবেরী মেয়েটা ফক্কোড়। মুখে মুখে ছড়া বানায় আর হি-হি করে হাসে। লজ্জা সরম কিছু নেই। বুকের কাপড় বার বার খুলে যায়, হুঁশ নেই সেদিকে। কিন্তু কি করা যাবে? ছুনিয়াটাই এই রকম। রাস্তায় ধুলো আছে বলে' তো পথ হাঁটা বন্ধ করা যায় না। তাছাড়া গরজ বড় বালাই। রত্নাকরকে যেমন করে' হোক ভালো করতেই হবে। তাপ্তির রাতে ঘুম হচ্ছে না। সারারাত পাখা হাতে করে বসে থাকে। রত্নাকর যদিও বার বার বলে—"তুমি শুয়ে পড়, ঘুমোও।" কিন্তু ঘুমোও বললেই কি ঘুমোনো যায়? যে মানুষ একটু আগে বলল—এবার আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ময়ূরপংখীতে চড়ে সমুদ্র যাত্রা করব গজদন্তের সন্ধানে—সেই মানুষ কিনা পেটের ব্যথায় ছটফট করছে। আর সব চেয়ে মুশকিল, কি হয়েছে কেউ ধরতে পারছে না। এতবড় নামী কবিরাজ জলধি, অমন নামজাদা গুণী অব্ধি—এরা বলছে কলায় কোন দোষ নেই। তবে পেট ব্যথা করছে কেন? কলা খাওয়ার পরই তো ব্যথা হল। জলধি বলছেন—বায়ু প্রকুপিত হয়েছে। তার মানে বুঝতে পারছে না তাপ্তি। তাই সে অবশেষে ঠিক করে ফেলল ওই জ্যোতিষী অম্বুধিকেই সে ডাকবে। কিন্তু তাকে ডাকতে হলে সাগরের খোশামোদ করতে হবে। সাগর যেখানে যেতে বলে সেখানেই যায় অম্বুধি। কারণও আছে। অম্বুধির পায়ে বাত, খুব আস্তে আস্তে হাঁটে, কানে শোনেও কম। যেখানে যায় সাগর তাকে কাঁধে করে' নিয়ে যায়। অপরের কথা তার কানে চেঁচিয়ে বলে' শুনিয়ে দেয়। সাগর একজন মল্লবীর। তার গায়ে প্রচুর শক্তি। ডন বৈঠক কুস্তি এইসব নিয়েই দিনরাত থাকে সে। খুব ভক্তি করে সে অম্বুধিকে। তার কোথাও যাবার দরকার

হলেই কাঁধে করে নিয়ে যায় তাকে। সুতরাং অম্বুধিকে আনতে হলে আগে সাগরকে বলতে হবে। সাগরের কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার স্ত্রী বিতস্তাকে। অদ্ভুত মেয়ে ওই বিতস্তাও। লিকলিকে রোগা শ্যামবর্ণ ওই মেয়েটা তার ওই পালোয়ান স্বামীকে যেন হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছে। বিতস্তার কথায় সাগর উঠে বসে। যদিও কালো তবু সুন্দর একটি শ্রী আছে মেয়েটির। রাঁধেও খুব ভালো। সাগরও খাদ্য-রসিক লোক। খাইয়েই বশ করেছে ওকে বিতস্তা। মেয়েটি সত্যিই রাঁধতে পারে ভালো। রত্নাকরকে এ-অঞ্চলে ভালোবাসে সবাই। রত্নাকর যখন বাণিজ্যের জন্য নৌকো করে বিদেশে যায় তখন প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। সাগরকে একজোড়া চন্দন কাঠের মুগুর এনে দিয়েছে, আর বিতস্তাকে দিয়েছে একটি রূপোর শত-কৌটা। একশটা কৌটো একটার ভিতর আর একটা ঢোকানো। সেই কৌটোয় ভরে ক্ষীর পায়েস নানা রকম মিষ্টান্ন, নানা রকম ব্যঞ্জন, নানা রকম ডাল, নানাবিধ পলান্ন খিচুড়ি রেঁধে পাঠিয়েছিল বিতস্তা। রত্নাকরের খুব ভালো লেগেছিল। রত্নাকরের তো সব ভালো লাগে। সবাইকে ভালো লাগে। কিন্তু এসব ভালো লাগালাগি ভালো লাগে না তাপ্তির। আগুন আর ঘিয়ের উপমাটা মিছে নয়। তাপ্তি পারতপক্ষে কাউকে আসতে দেয় না কাছে। কিন্তু এখন দিতেই হবে। অন্য উপায় নেই। যেতেই হল সাগরের কাছে।

গিয়ে দেখে সাগর মাথায় একজন, ঘাড়ে একজন, দুই প্রসারিত বাহুর উপর দুজনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাপ্তিকে দেখে সবাই নেমে পড়ল। সাগর বলল—"তাপ্তি দেবী যে, কি খবর? শুনেছিলাম রত্নাকর অসুস্থ। কেমন আছে সে?"

"সেইজন্যেই তো আসা। পেট ব্যথা হয়েছে ফল্গুর বাগানের কলা খেয়ে। জলধি কবিরাজ বলেছেন বায়ু প্রকুপিত। আর গুণী অব্ধি বলেছেন কলায় কোনও দোষ নেই—বুঝতে পারছি না কি হয়েছে।

তাই ভাবছি জ্যোতিষী অম্বুধিকে দিয়ে ওর হাতটা দেখাই একবার। তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও ভাই। বিতস্তা কোথায়?”

“বিতস্তা রান্নাঘরে। রান্নাঘরের ভিতর গাছ-কোমর বেঁধে মহা ব্যস্ত সে এখন। মাথার চুল ঝুঁটি করে বেঁধেছে। চারদিকে তরকারী, মাছ মাংস। ছুটো শিলে বাটনা বাটছে ছুটি চাকর, তরকারী কুটতে কুটতে হিম্-সিম্ খেয়ে যাচ্ছে ছুটো ঝি। তাদের মাঝখানে রাজলক্ষ্মীর মতো বসে আছে বিতস্তা। চল—”

“রান্না করছে, সেখানে এখন না-ই গেলাম—”

“রান্নাঘরই তো ওর বৈঠকখানা। তুমি এসে দেখা না করে’ চলে গেছ শুনলে তুলকালাম করবে। কচি বেতের ডগার তরকারি করছে আজ। তোমাকে হয়তো খেতে হবে—চল—”

খেতে হল তাপ্তিকে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এলাহি রান্নার আয়োজন। বিতস্তা গাওয়া ঘি-এ হরিণের মাংস ভাজছে মশলা দিয়ে। অপূর্ব গন্ধ বেরিয়েছে। তাপ্তিকে দেখেই সে তার মিষ্টি হাসিটি হাসল।

“ওমা, কি আমার ভাগ্যি। রত্নাকরের হৃদয়-রত্ন গরীবের ঘরে। ওলো সাবি, তুই মাংসটা ভাজ একটু। আমি কথা কই তাপ্তির সঙ্গে—”

প্রকাণ্ড রান্নাঘর। তারই একপাশে একটা মোড়া পেতে দিলে সে তাপ্তির জন্য।

“কি ব্যাপার কি, বল তো। হঠাৎ এ সময়ে এলে যে—”

“বলছি সব—”

সাগর বাইরে চলে গেল। তাপ্তি সব বললে বিতস্তাকে, বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ছলছল করতে লাগল বিতস্তার চোখও। বলল—“কাল অম্বুধিকে নিয়ে যাব আমরা।”

তাপ্তি শঙ্কিত হয়ে পড়ল মনে মনে। অম্বুধির সঙ্গে ইরাবতী

কাবেরী তো যাবেই, তার সঙ্গে এ-ও যদি যায় তাহলে তো ত্র্যহস্পর্শ হবে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্য তাপ্তি বলল—"তুমি এত রাঁধছ, বাড়িতে খাবার লোক তো দু'জন।"

বিতস্তা বলল—"বিশ জন। ওঁর আখড়ার সব চেলারা এখানে খায়।"

"ও তাই বুঝি। তোমার কর্তাও খুব খাইয়ে শুনেছি।"

"খাইয়ে মোটেই নয়। একটা জিনিসের বেশী খায় না কিছু। কোনদিন বা মাংস খেলে, কোনদিন বা পায়েস। আমার রাঁধবার বাতিক বলে নানা রকম রাঁধি। রুটি, পরোটা, ভাত, ডাল-তরকারি রাঁধবার আলাদা লোক আছে। আমি সৌখীন রান্না রাঁধি। আজ কচি বেতের ডগার ডালনা করেছি। চেখে দেখবে একটু? নুনটা দিয়েছি কিনা মনে পড়ছে না। একটু চেখে দেখ।"

"বেতের ডগা শক্ত হবে না?"

"কাল থেকে মাখনে ডুবিয়ে রেখেছি। খুব নরম হয়েছে—।"

তাপ্তিকে খেতেই হল একটু। খেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। কি চমৎকার স্বাদ। বেতের ডগা? মনে হল যেন ছানার টুকরো।

বিতস্তা বলল—"কাল তোমার কর্তার জন্যেও নিয়ে যাব কিছু রেঁধে। আমার রান্না খুব ভালোবাসেন তিনি—"

"এখন পেটে ব্যথা, এখন কিছু নিয়ে যেও না ভাই।"

"বাতাবী লেবুর মিষ্টি আচার বানিয়েছি আনারসের রস দিয়ে। খুব হজমি। ওতে কোনও অসুখ করবে না। অসুখ ভালোও হয়ে যেতে পারে।"

তাপ্তির মোটেই ভালো লাগছিল না এসব প্রস্তাব। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারল না। অম্বুধি গণককে ওরাই নিয়ে যাবে। ওদের চটানো যায় কি? বিতস্তা লোকও খারাপ নয়। কিন্তু রত্নাকরের উপর সকলেরই একটু না একটু দুর্বলতা। সে যে কি করবে ভেবে পায় না।

॥ ৬ ॥

তার পরদিন সাগর অম্বুধির বাড়ি গিয়ে দেখে অম্বুধি গাঁজা খেয়ে ভম্ হয়ে বসে আছে মহেশ্বরের মন্দিরের ভিতর। সে কোথাও যেতে পারে না বলে উঠোনেই মহেশ্বরের একটি ছোট মন্দির করিয়েছে। সাগর গিয়ে দেখল তার ভিতর ঊর্ধ্ব নেত্র হয়ে বসে আছে অম্বুধি। তিন্তিড়ী আজকাল যে গাঁজা সরবরাহ করছে তা নাকি অত্যন্ত কড়া।

ইরাবতী আর কাবেরী ব্যস্ত ছিল গুড়ের নাগরি নিয়ে। ওরা আখ কিনে গুড় তৈরী করে চালান দেয়। আজ নৌকো যাবে বিদ্যা-নগরে। রত্নাকরেরই নৌকা। ওতে ওরা গুড় পাঠাবে। রত্নাকরের বিরাট ব্যবসা। রোজই কোথাও না কোথাও মাল পাঠানো হয়। আজ বিদ্যানগরে মাল যাচ্ছে। সেখানে গুড়ের বাজার ভালো।

সাগর গিয়ে বলল—"রত্নাকরের পেটে ব্যথা। কাল তাপ্তি এসেছিল। জলধি আর অব্ধি রোগ ধরতে পারছে না। তাপ্তির ইচ্ছে অম্বুধিকে দিয়ে ওর হাতটা দেখাবে—।"

"কিন্তু দেখাবে কাকে দিয়ে। ও তো সকাল থেকে শিবনেত্র হয়ে বসে আছে। তাছাড়া ওকে নিয়ে গেলে আমাকেও যেতে হয়—।"

কাবেরী সঙ্গে সঙ্গে বলল—"আমিও যাব।"

সাগর বলল—"তোমাদের যাওয়ার দরকার কি—"

"বাঃ, রত্নাকর অসুস্থ এ খবর পেয়ে কি না গিয়ে থাকতে পারি?"

কাবেরী হেসে ছড়া কাটল—'সম্ভব নয় যা, বলছ কেন তা। তুমি এখন জামাইবাবুর ভাঙাও দেখি ধ্যান, ফেরাও দেখি জ্ঞান—"

সাগর বলল—"দু' কলসী ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে দিলেই জ্ঞান ফিরে আসবে। দাঁড়াও আমি ওকে মন্দির থেকে বার করি আগে—।"

অম্বুধি ছোট খাটো মানুষ। তাকে সাগর পাঁজা-কোলা করে তুলে নিয়ে এল মন্দিরের ভিতর থেকে। উঠোনের মাঝখানে একটা বড় পিঁড়ের উপর বসানো হল তাকে। ঘরে মাটির কলসিতে পুকুরের ঠাণ্ডা জল ছিল। সাগর সেই জল হুড় হুড় করে ঢালতে লাগল তার মাথায়। দু' কলসী ঢালবার পর জ্ঞান ফিরল অম্বুধির। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। তারপর বলল—"বাবা এ কি করছ মহেশ্বর। সব গরম যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—।"

সাগর তখন কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল—"মহেশ্বর নয়, আমি জল ঢালছি। রত্নাকরের কাছে যেতে হবে। তার পেট ব্যথা। তার হাত দেখে গুণে বলতে হবে কি হয়েছে ?"

গুম হয়ে রইল অম্বুধি। ইরাবতী একটা গামছা দিয়ে তার মাথা গা মুছিয়ে দিয়ে বলল—"ওঠ শুকনো কাপড় পর একটা।"

অম্বুধি শুকনো কাপড় পরে হঠাৎ বলে উঠল—"গুরুদেব মানা করেছেন, আমি আর হাত দেখব না কারো—"

"গুরুদেব ? তিনি হঠাৎ মানা করলেন কেন ?"

"গুরুদেব বললেন—কপালে যা আছে তা ঘটবেই। যাকে রোধ করা যাবে না তখন আগে থাকতে তা জেনে কোনও লাভ নেই। লোকের মনে আশা বা হতাশা জাগিয়ে শুধু তাকে অকারণ অশান্ত করা হয়। যা ঘটবার তা ঘটবেই। তাছাড়া আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে আজকাল। আমরা নবগ্রহ, বারোটা রাশি, আর সাতাশটা নক্ষত্র নিয়ে গণনা করি। আকাশে কিন্তু কোটি কোটি নক্ষত্র। তাদের কি কোনও প্রভাব নেই আমাদের উপর ? জ্যেষ্ঠা বা শ্রবণা যদি আমাদের প্রভাবিত করতে পারে, অগস্ত্য বা লুব্ধক কেন পারবে না ? সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটা বড় জ্যোতিষ্করা ছোট নয়। কেন তারা আমাদের ভাগ্য নির্দেশে সহায়ক হবে না। গুরুদেবকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন—ওসব আকাশ-কুসুম নিয়ে চিন্তা কোরো না। বাইরের আকাশ থেকে দৃষ্টিকে মনের

আকাশের দিকে নিয়ে যাও। সেইখানেই সত্য নিহিত আছে। সেইটে উপলব্ধি কর। লোকের হাত দেখে বেড়ানো শুধু সময় নষ্ট।"

সাগর বলল—"তিনি যদি তোমাকে বলেন তাহলে তুমি দেখবে তো? অন্য লোক হলে পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু রত্নাকরের অসুখে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। তার মত লোক এ অঞ্চলে নেই। তাছাড়া তার সঙ্গে আমরা কোন না কোন বন্ধনে জড়িত। তোমার গুরু অর্ণবের আশ্রম তিনিই করিয়ে দিয়েছেন। সে আশ্রমের ব্যয়ভারও তিনি বহন করেন। সুতরাং তার হাত দেখব না একথা বলা উচিত নয়। তোমার গুড় তার নৌকাতেই বিদেশের হাটে যায়। চল তোমার গুরুদেব অর্ণবের কাছেই যাওয়া যাক—"

ইরাবতী বললেন—"তোমরা তাহলে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে এস। আমি আর কাবেরী নাগরিগুলোতে মা-লক্ষ্মীর সিঁদুর মাখিয়ে দিই। ওরে বহু, তুই তুলসী পাতা এনেছিস? সবু কোথা? তাকে সিঁদুর গোলাটা আনতে বল—"

সর্বরূপ আর বহুরূপ দুই ভাই। তাদের মা অম্বুধির বাড়িতে কাজ করত। সে মারা গেছে, তার দুটি ছেলে এখন তার জায়গায় কাজ করে। তারা চাকরের কাজই করে, কিন্তু তারা চাকর নয়, বাড়ির পরিজন। গুড়ের ব্যবসার সব হাঙ্গামা তাদেরই উপর।

তাদের নিয়ে ইরাবতী আর কাবেরী গুড়ের নাগরী সাজাতে বসল। সাগর অম্বুধিকে কাঁধে করে চলে গেল অর্ণবের কাছে।

॥ ৭ ॥

অর্ণব খুব ফরসা, খুব লম্বা আর খুব রোগা। দাড়ি চুল গোঁফ কালো নয়, সোনালী। চোখের তারা নীল। হাঁটে মাথা উঁচু করে। বসে পিঠ সোজা করে। খুব স্বল্প-ভাষী। আশ্রমে তার শাসন খুব কড়া। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী তার তিনজন শিষ্যাকে রোজ শাস্ত্রপাঠ করতে হয় এবং পড়া দিতে হয়। পড়া না পারলে খাওয়া বন্ধ। কবি পারাবারের স্ত্রী ব্রাহ্মণীও অর্ণবের ভক্ত একজন। অর্ণবের কঠোর দিকটা মুগ্ধ করেছে তাকে। অর্ণব রোজ যখন নদীর ধারে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে করজোড়ে তপস্যা করে তখন ব্রাহ্মণীর মনে হয়—অর্ণব নিজেই বুঝি সূর্য। ব্রাহ্মণীকে অর্ণব বলেছে —তুমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। প্রত্যহ সহস্রবার হরিনাম জপ কর। তারপর একে একে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, উপনিষদ এইগুলো পড়ে ফেল। যেখানে বুঝতে পারবে না, আমার কাছে এসো বুঝিয়ে দেব। প্রয়োজন না হলে আমার কাছে আসবে না। আর এটা জেনে রাখো তোমার স্বামী পারাবারকে সুখী রাখাই তোমার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

এ শুনে ব্রাহ্মণীর ভক্তি আরও বেড়ে গিয়েছিল। গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণী নাম অর্ণবই রেখেছিল। ওরা হঠাৎ একদিন হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হয়েছিল তার কাছে। এসে বলল—"আমাদের আশ্রয় দিন।"

"তোমরা কে?"

গঙ্গা বলল—"আমি পথিক।"

যমুনা বলল—"আমি পথ খুঁজছি।"

সরস্বতী বলল—"আমি পথ হারিয়েছি।"

উত্তর শুনে খুশী হয়েছিল অর্ণব। বলল—"আমি সন্ন্যাসী। আমার স্ত্রী আছে। আমি একাহারী, ফল খেয়ে থাকি। আমার স্ত্রী মাঠে কাজ করে। তোমাদের তিনজনকে আশ্রয় দেবার আর্থিক সামর্থ্য নেই আমার। তবে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি যাতে হয় তার চেষ্টা আমি করব। কিন্তু তোমরা থাকবে কোথায়?'

"আধ্যাত্মিক উন্নতিই আমরা চাই।" গঙ্গা বলল।

যমুনা বলল—"কিন্তু মনোমত গুরু পাচ্ছি না। অনেক জায়গায় ঘুরেছি।"

সরস্বতী বলল—"নিষ্পাপ লোক দেখতে পাই নি। সবার চোখের দৃষ্টিতেই কাম আর কলুষ। আপনাকে দেখে আমাদের ভক্তি হয়েছে।"

"কিন্তু তোমরা থাকবে কোথায়?"

"আপনার এই কুটিরের বাইরে শুয়ে থাকব রাত্রে। আর দিনে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মাঠে কাজ করব। মাঠ এখান থেকে কতদূর?"

"আমার চারপাশে যে মাঠ দেখছ এসবই আমার বন্ধু রত্নাকর আমাকে কিনে দিয়েছেন। আমার স্ত্রী মন্দাকিনী জন-মজুর নিয়ে কাজ করে এই মাঠে। ওই যে সব ফসল দেখছো, সব আমাদের।"

গঙ্গা বলল—"তাহলে আমরাও এই মাঠে কাজ করব।"

"কিন্তু রাত্রে শোবে কোথায়?"

"ওই গাছটার তলায় পাশাপাশি তিনজন শুয়ে থাকব।"

"সেটা কি ভালো দেখায়? আচ্ছা আমি রত্নাকরকে বলছি সে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।"

রত্নাকর ওদের আশ্রয় করে দিয়েছিল। এই হল ত্রিবেণী আশ্রমের ইতিহাস। অর্ণব এদের তিনজনকেই মন্ত্র দিয়েছিল আর তিনজনকেই খুব কড়া শাসনে রাখত। ব্রাহ্মণীকে সে উপদেশ দিত। মন্ত্র দেয় নি। বলেছিল, তোমার স্বামীই তোমার গুরু, মন্ত্র যদি নিতে চাও তার কাছেই নাও। রত্নাকরও মন্ত্র নিতে চেয়েছিল তার

কাছে। তাকেও মন্ত্র দেয় নি অর্ণব। বলেছিল—খোঁড়া লোকই ঘোড়া চড়ে, তুমি তো খোঁড়া নও। মন্ত্রের ঘোড়া নিয়ে কি করবে তুমি? তুমি পদস্থ স্বাধীন লোক। যেমন আছ থাকো। জ্যোতিষী অম্বুধি কিন্তু ছাড়ে নি। অর্ণবের অনন্য রূপ, অদম্য উৎসাহ, অটল সংযম দেখে অম্বুধির ধারণা হয়েছিল ইনি যদি আমাকে মন্ত্র দেন আমার হিল্লে হয়ে যায়। অর্ণবকে গিয়ে ধরল একদিন।

"আপনি মহাপুরুষ। আমি মূর্খ। সামান্য জ্যোতিষ শিখেছিলাম—"

অর্ণব বলল—"অসামান্য অসাধারণ জ্যোতিষী তুমি। আমার কাছে কি দরকার?"

"আমাকে শিষ্য করুন।"

"মহেশ্বরের মন্দিরে রোজ প্রার্থনা কর তো—"

"করি। কিন্তু কেমন যেন আবোল-তাবোল হয়ে যায়। আমার প্রার্থনার ভাষাটা আপনি ঠিক করে দিন। আমি কানে কম শুনি, ভালো করে হাঁটতে পারি না। আমার অনেক দুঃখ—হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল অম্বুধি। শেষকালে লুটিয়ে পড়ল অর্ণবের পায়ে। নিতান্ত বিব্রত হয়ে অর্ণব শেষকালে রাজি হলেন মন্ত্র দিতে। বলল—"তোমার প্রার্থনাটা আমি লিখে দেব। সেইটে মুখস্ত করে রোজ একাগ্র চিত্তে মহেশ্বরকে সেটা নিবেদন করবে। একাগ্রতাটাই আসল। তুমি মহেশ্বরের কাছে কি চাও—"

"কষ্ট থেকে মুক্তি—।"

"তাহলে সেইটেই সহজ ভাষায় বলো মহেশ্বরকে। তিনি কীটের ভাষাও বুঝতে পারেন। তোমার ভাষাও বুঝবেন।"

অম্বুধি কিন্তু অনড়। বলল, "আমায় মন্ত্র দিন।"

"মন্ত্র! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এদের কারো একটা নাম বারবার জপ কর। ওরা তিনই এক, একই তিন। ওদের প্রত্যেকেরই অনেক নাম আছে। তুমি যে কোনও একটা নাম জপ কর। আলাদা মন্ত্র নেবার দরকার কি—"

"আপনাকে কিন্তু আমি গুরুপদে বরণ করতে চাই। আমি চলতে পারি না, শুনতে পাই না। আপনি আমার সহায় হোন।"

"বেশ। কিন্তু আমাকে বিনা প্রয়োজনে এসে বিরক্ত করবে না।"

"করব না। যখন আমার মনে কোনও প্রশ্ন জাগবে তখন আসব খালি—"

"বেশ—"

অর্ণবের আর শিষ্য নেই। অর্ণব যখন এখানে এসেছিল সস্ত্রীকই এসেছিল। তার স্ত্রী মন্দাকিনী অপরূপ সুন্দরী। অর্ণবের কোথায় জন্ম, কোথায় সে তপস্যা করেছিল, কেউ তা জানে না। হঠাৎ সে মন্দাকিনীকে নিয়ে এসে বসেছিল ওই মাঠের মাঝখানে বিশাল শিরীষ গাছটার তলায়। গাঁয়ের একটি মেয়ে তাদের দেখে ভেবেছিল —বুঝি ওরা দেবতা। সে তার অন্ধ স্বামীকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল নাকি তাদের কাছে। বলেছিল—দেবতা, আমার স্বামীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। অর্ণব তার চোখে হাত বুলিয়ে দিতেই ফিরে পেল সে দৃষ্টি। তারপর শত শত আর্ত আতুরের ভীড় লেগে গেল। অর্ণব আর মন্দাকিনী পালিয়ে গেল একটা বনের মধ্যে। রত্নাকর খবর পেয়ে খুঁজে বার করল তাদের। অর্ণব বলল—"আমি জনপদে যাব না। মানুষের রোগ সারানো আমার কাজ নয়। দৃষ্টিহীন ভগবানের দয়ায় দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। ওতে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই।" রত্নাকর বলল—"আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করব তাঁকে। তিনি যেন ঘোষণা করে দেন রোগ সারাবার জন্য কেউ যেন আপনার কাছে না আসে। রাজ-ঘোষণা হয়ে গেলে আপনি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে পারবেন। কারণ এদেশে রাজ-ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রাণদণ্ড হয়।"

মহেশ্বর অঞ্চলের রাজা ছিলেন পৃথ্বীপতি শঙ্কর দাস। রত্নাকরকে খুব খাতির করতেন তিনি। তিনি ঘোষণা করলেন অর্ণবের কাছে ব্যাধি সারাবার দাবী বা প্রার্থনা নিয়ে যে যাবে তার প্রাণদণ্ড

হবে। তাঁকে যেন বিরক্ত না করা হয়। রত্নাকরের অনুরোধেই রাজা তাঁকে পঁচিশ বিঘে নিষ্কর জমি দান করতে চাইলেন। অর্ণব বলল—কারো দান আমি নেব না। তখন রত্নাকর রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তাঁকে দিয়ে একটা যজ্ঞ করালেন এবং সেই পঁচিশ বিঘে জমি কিনে দক্ষিণাস্বরূপ দিলেন তাঁকে। এতে আপত্তি করে নি অর্ণব।

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। অর্ণব আর মন্দাকিনীর সত্য ইতিহাস কেউ জানে না। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে নানারকম অদ্ভুত গুজব প্রচলিত আছে। তিন্তিড়ী একটা আশ্চর্য গল্প বলে। তার বিখ্যাত গাঁজার জন্য অনেক লোক গাঁজা কিনতে আসে সেখানে। লবঙ্গ দেশের একটি লোক তাকে নাকি বলেছিল যে মন্দাকিনী লোহিত দেশের রাজকন্যা। লোহিত রাজার একমাত্র সন্তানও সে। অপরূপ সুন্দরী এই রাজকন্যাই যে ভবিষ্যতে সিংহাসনে আরোহণ করবে এই কথাই সবাই জানত। কিন্তু নিয়তির বিধানে হয়ে গেল অন্যরকম। রাজকন্যার বয়স যখন বারো বছর তখন হঠাৎ একদিন সর্পাঘাতে মৃত্যু হল তাঁর। রাজপুরী শোকে সমাচ্ছন্ন হল। লোহিতরাজ গণপতি শোকে উন্মত্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন মন্ত্রী বললেন—"মহারাজ ম্লেচ্ছ দেশ থেকে একজন তপস্বী এসেছেন, তিনি বলেছেন, রাজকন্যাকে বাঁচিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর একটি শর্ত আছে। তাঁকে ডাকব ?" মহারাজ বললেন "ডাক ডাক এক্ষুণি ডাক।" অর্ণব এসে বললেন—"উনি রাজকন্যারূপে বাঁচবেন না, সন্ন্যাসিনীরূপে বাঁচবেন। রাজকন্যার আয়ু ফুরিয়েছে। উনি যে মুহূর্তে পুনর্জীবন লাভ করবেন সেই মুহূর্তে উনি যদি কোনও সন্ন্যাসীকে পতিত্বে বরণ করেন তাহলে দীর্ঘজীবন লাভ করবেন।" রাজা বললেন—"সন্ন্যাসী পাত্র আমি কোথা পাব ? আপনি তো সন্ন্যাসী, আপনি ওকে বিয়ে করবেন ?" অর্ণব উত্তর দিলেন—"করতে পারি। আমারও একজন জীবন-সঙ্গিনীর প্রয়োজন। কিন্তু ওঁকে বিয়ে করবা মাত্রই আমি ওঁকে নিয়ে এদেশ ত্যাগ ক'রে চলে যাব।"

রাজা বললেন—"মন্দাকিনী আমার উত্তরাধিকারিণী। আপনি ওকে বিয়ে করে এ রাজত্বের ভার নিন—"

"সন্ন্যাসী কখনও বিষয়ে লিপ্ত হয় না। যে মুহূর্তে আমি বিষয়ের বিষ পান করব, সেই মুহূর্তে সন্ন্যাসীর মৃত্যু হবে এবং সেই মুহূর্তে আপনার কন্যা মন্দাকিনীও দেহত্যাগ করবে। কারণ ও তখন আর সন্ন্যাসিনী থাকবে না—"

রাজা মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। শেষে যখন দেখলেন আর গত্যন্তর নেই তখন রাজি হলেন তিনি। অর্ণব স্পর্শ করবামাত্র বেঁচে উঠল মন্দাকিনী। সেইদিনই তাকে বিয়ে করে লোহিত রাজ্য ত্যাগ করল সে। লোকে বলে লোহিতরাজ নাকি একজন চর নিযুক্ত করেছেন ওদের অনুসরণ করবার জন্য। সে চর নাকি গোপনে মন্দাকিনীকে টাকাকড়ি দিয়ে আসে। মন্দাকিনী যদিও মাঠে জন মজুরের সঙ্গে কাজ করে, গেরুয়াও পরে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা নয়। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যেমন মন্দিরে মন্দিরে পুজো করে, গান করে, ভাগবত পাঠ করে, ব্রত উপবাস করে, রোজ নদীতে স্নান করে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে উপাসনা করে, মন্দাকিনী কিন্তু কিছু করে না। নির্বাক হয়ে সে মাঠে কাজ করে কেবল। কারো সঙ্গে মেশে না। ভ্রূকুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করে' কাজ করে' যায় খালি। সে কাউকে ধরা ছোঁয়া দেয় না বলে' তাকে নিয়ে নানারকম গুজব রটায় লোকে। কিন্তু তার কাছে যেতে সাহস করে না কেউ। অর্ণবের প্রতি তার সত্য মনোভাব কি তা কেউ জানে না। সে যে রোজ অর্ণবের পাদোদক পান করে এ-ও কারও জানা নেই। কারণ একটা বড় হাঁড়িতে জল ভরে অর্ণবকে তাতে পা ডোবাতে বলে সে মাঝে মাঝে। সেই জল খুব ভোরে সে খায় রোজ একটু করে'। এক হাঁড়ি জল চলে অনেকদিন। এটা তার পাগলামি না ভক্তির লক্ষণ তা ঠিক করে বলা শক্ত। অর্ণব তার কোনও কাজেই বাধা দেয় না। যখনই সে জলের হাঁড়িতে পা ডোবাতে বলে তখনই হাসিমুখে

ডান-পা-টা ডুবিয়ে দেয়। অর্ণব বোধহয় ভুলতে পারে না যে সে একদিন রাজকন্যা ছিল। তাই তার কোনও আচরণে বাধা দেয় না সে। লোহিত রাজ্যে মহাদেব নীললোহিত নামে পূজিত হন। মন্দাকিনীর বাবা গণপতির বাড়ির সামনে বিরাট মণিমাণিক্য খচিত নীললোহিতের মন্দির ছিল একটি। সে মন্দিরে মন্দাকিনী রোজ মহাদেবকে পুজো করত। অর্ণবের মাঝে মাঝে মনে হয় সেই নীললোহিতই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীকে তার কাছে পাঠিয়েছেন মন্দাকিনীর সেবা করবার জন্য। সত্যিই তারা মন্দাকিনীকে পরিচারিকার মতো সেবা করে। কুটোটি নাড়তে দেয় না তাকে। রান্নাবান্না, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সব তারাই করে। জমির কাজও করে মন্দাকিনীর সঙ্গে। অর্ণবের মনে হয় নীললোহিতের ইচ্ছাতেই এসব হচ্ছে। মন্দাকিনী এখানেও মহেশ্বরের মন্দিরে রোজ যায়। গভীর রাত্রে যায়। এখানে সকলেই একা মহেশ্বরের মন্দিরে যায়। সে যে সময় মহেশ্বরকে প্রার্থনা করে, সে সময় তার কাছে কেউ থাকে না। যে যখন সময় পায় যায়। মহেশ্বর অঞ্চলে মহেশ্বরের অনেক মন্দির। অনেকে নিজের বাড়ির সামনে নিজের জন্যে মন্দির করিয়ে নিয়েছে। রত্নাকরের নিজের মন্দির আছে। অম্বুধির নিজের মন্দির আছে। আরও অনেকের আছে। শ্মশানের মাঝখানে যে মন্দিরটা আছে সেখানেই মন্দাকিনী যায়। সেখানে গিয়ে সে প্রার্থনা করে, হে মহেশ্বর, হে নীললোহিত, তুমি রত্নাকরের মঙ্গল কর। রত্নাকর আমাদের আশ্রয় দিয়েছে। রত্নাকর আমাদের জমি দিয়েছে, সেই জমিতে কাজ করে আমি নিজের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করি, জমি কর্ষণ করে, তাতে বীজ বপন করে' আমি শত শত শস্যের শিশু অঙ্কুরকে লালন করি। আমার বন্ধ্যা হৃদয় এতে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করে। এসবই সম্ভব হয়েছে রত্নাকরের জন্য। হে বিশ্বেশ্বর, তুমি তার মঙ্গল কর। নিজের জন্য বা অর্ণবের জন্য কোনও প্রার্থনাই সে করে না। তার এ প্রার্থনার খবর আমরা তিন্তিড়ীর কাছে পেয়েছি। সে বিবরণ পরে দেব। মন্দাকিনীর এ

প্রার্থনা থেকে যদি কারো মনে হয় মন্দাকিনী রত্নাকরের প্রেমে পড়েছিল, তাহলে আমি তাকে মনে করিয়ে দেব গভীর শ্রদ্ধা আর গভীর প্রেমে খুব তফাত নেই। শ্রদ্ধাই বোধহয় প্রেমের শুদ্ধতম রূপ।

আসল গল্প থেকে কিন্তু কথায় কথায় অনেক দূর সরে এসেছি। মল্লবীর সাগর সেদিন যখন জ্যোতিষী অম্বুধিকে নিয়ে অর্ণবের কাছে এসে হাজির হল তখন অর্ণব নদীর ধারে একপায়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে তপস্যা করছিল। সাগরের সঙ্গে ছিল দশজন চাকর। প্রত্যেকের মাথায় এক নাগরী গুড়। ইরাবতী ত্রিবেণী সঙ্গম আশ্রমের জন্য গুড় পাঠিয়েছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ছুটে এল। তিন জনে তিনটে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল সাগরকে আর অম্বুধিকে। মন্দাকিনী কিছু নাড়ু বার করে' এনে খেতে দিল ওদের। বলল—"উনি এখুনি আসবেন। ওঁর খাওয়ার সময় হয়েছে—"

বলে সেও একটা পাখা নিয়ে নীরবে হাওয়া করতে লাগল ওদের।

একটু পরেই এসে পড়ল অর্ণব।

"কি ব্যাপার, তোমরা হঠাৎ এসে পড়লে কেন?"

সাগর বলল—"রত্নাকর অসুস্থ। তাপ্তির ইচ্ছে অম্বুধি গণনা করে বলে দিক তার কি হয়েছে। ভালো হবে কি না। কিন্তু অম্বুধি বলছে আপনি তাকে না কি জ্যোতিষ চর্চা করতে মানা করেছেন। তাই আমরা আপনার অনুমতি নিতে এসেছি অম্বুধি রত্নাকরের হাত দেখবে কি না—" অর্ণব হেসে বলল—"জ্যোতিষ চর্চা করা পাপ নয়। সুতরাং করবে না কেন? আমি ওকে মানা করেছিলাম কারণ ওতে সময় নষ্ট হয়। অনিবার্যকে নিবারণ করবার সাধ্য যখন কারো নেই তখন তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা। যা হবার তা তো হবেই। রত্নাকরের বা তাপ্তির সেটা জানবার যখন কৌতূহল হয়েছে, আর তুমি সেটা যখন বলে' দিতে পারো, দাও। আমি আপত্তি করব কেন। রত্নাকর আমাদের সকলের প্রিয়, সকলের হিতৈষী। সে যখন চাইছে, তখন দাও না তার হাত দেখে। এর জন্য আমার অনুমতি নেবার কোন

প্রয়োজন ছিল না। মনে রেখো, শিষ্য গুরুর ক্রীতদাস নয়। কোন গুরু শিষ্যের স্বাধীনতা হরণ করে না। ভগবানের প্রধান গুণ তিনি সর্বতোভাবে স্বাধীন। গুরুর কাজ সেই ভগবানের স্বরূপ শিষ্যের কাছে প্রকাশ করা। শিষ্যকে দাসমনোভাবাপন্ন করা নয়।"

অম্বুধি হাত জোড় করে বসে রইল। কোন উত্তর দিল না। অর্ণব আরও বলল—"আমি এই জন্যেই কারুকে শিষ্য করতে চাই না। শিষ্যরা প্রায়ই নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। তাতে মহাক্ষতি—।"

অম্বুধি হাত জোড় করে' বসেই রইল। কোন উত্তর দিল না। অর্ণব কুটিরের ভিতর চলে গেল। সাগর তখন চেঁচিয়ে অম্বুধিকে বলল—"তোমার গুরু তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এবার চল রত্নাকরের বাড়ি যাই।"

॥ ৮ ॥

তাপ্তি সকালে ঘরের জানালা খুলেই চমকে উঠল। ফল্গু আসছে। তার পিছনে একটা চাকর। তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা ঝুড়িতে বড় বড় আনারস। তাপ্তির মনে হোল ফল্গু যেন উন্মনা হয়ে উড়তে উড়তে আসছে। তার মাথায় ঘোমটা নেই। পেছনে বেণী দুলছে। বেণীর শেষ প্রান্তে দুলছে টকটকে লাল একটা ফুল। পরনের শাড়ির রং লাল আর সোনালীতে মেশানো। মনে হচ্ছে সন্ধ্যার একটুকরো মেঘ যেন জড়িয়ে আছে ওর সর্বাঙ্গে। তাপ্তির বুকটা কেঁপে উঠল। ও মেয়েকে তো কিছুই বলা যাবে না। এখনই এসে গলা জড়িয়ে ধরবে।

"কাকীমা কপাট খোল—"

কপাট খুলে দিতেই ফল্গু সত্যই গলা জড়িয়ে ধরল তার।

"কাকুর নাকি অসুখ করেছে। তুমি তো আমাকে খবর পাঠাও নি—কি হয়েছে কাকুর—।"

"তোমার কলা খাওয়ার পর থেকে সেই যে পেট ব্যথা শুরু হল তা আজও সারে নি। জলধি, অব্ধি কেউ ধরতে পারছে না কি হয়েছে। সাগর আজ অম্বুধিকে নিয়ে আসবে। অম্বুধি বড় জ্যোতিষী, সে হয়ত কিছু বলতে পারবে—"

"কাকুকে আমি আনারসের রস খাওয়াব। তাহলেই ভালো হয়ে যাবেন উনি। আমি নিজে হাতে রস করে দেব। আমাকে বাটি আর খল নোড়া দাও—"

তাপ্তির অন্তরাত্মা শিউরে উঠল। যে ফল্গুর কলা খেয়ে রত্নাকর পেটের ব্যথায় ভুগছে সেই ফল্গুই আবার তাকে আনারস খাওয়াতে এসেছে। কি সর্বনাশ। কিন্তু সে জানে ফল্গু কারো

বারণ শুনবে না। তবু সে ক্ষীণকণ্ঠে বললে—"এখন আনারস খাওয়াবে? পেটের ব্যাথা সারে নি এখনও।"

"কাকু কি খাচ্ছেন এখন—"

"মৌরলা মাছের ঝোল আর পুরোনো চালের ভাত—"

"দুধ খান না?"

"দুধও খান।"

"কাকু তো ক্ষীর খেতেন রোজ—"

"দুধ একটু ঘন করে দি—"

"তাহলে আনারসের রস খেলে কিছু হবে না। এ শিঙ্গাপুরের ভালো আনারস। হজমী—" আনারসের ঝুড়ি নিয়ে ভিতরে চলে গেল ফল্গু। তাপ্তি গেল পিছনে পিছনে। গিয়ে দেখল রত্নাকর বিছানায় বসে খাতা-পত্র দেখছেন।

"এ কি কাকু, শুনলাম তোমার অসুখ করেছে। কিন্তু তোমাকে দেখে তা তো মনে হচ্ছে না। কোথায় ব্যাথা—"

"পেটের কাছটায় একটু ব্যথা করে।"

"আনারসের রস করে দিচ্ছি খাও। সব সেরে যাবে—।"

"দাও—।"

তাপ্তি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফল্গু রস করবার জন্য চলে গেল ভিতরে।

একটু পরে একটি স্ফটিকের থালার উপর তিনটি স্ফটিকের বাটিতে আনারসের রস নিয়ে যখন ফল্গু এল তখন তাপ্তি বলে উঠল—"তিন বাটি রস খাওয়াবে?" উচ্ছ্বসিত কলহাস্যে হেসে উঠল ফল্গু।

"এক বাটি তোমার সামনে আমি খাব। আর এক বাটি তুমি, আর এক বাটি কাকু খাবে—। মরি তো তিনজনে এক সঙ্গে মরব।" এর পরই তিনটির গলা শোনা গেল।

"ফলি এখানে এসেছিস—"

"এসেছি। আমি কাকুর কাছে থাকব এখন, যাব না—"

সে হয়ত থেকেই যেত, কিন্তু এর পর অম্বুধিকে কাঁধে করে সাগর এসে পড়ল। সরবতটা খেয়ে সুট করে সরে পড়ল ফল্গু। ভীড় সে ভালোবাসে না।

অম্বুধি এসে যা বলল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না তাপ্তি।

সে বলল—"আমি রত্নাকরকে উলঙ্গ করে তার সমস্ত শরীরটা পরীক্ষা করতে চাই। শুধু হাত দেখে সব কথা বলা যাবে না। আমি যে বিদ্যা জানি তার নাম দশাঙ্গ বিদ্যা। রত্নাকর কি আমার সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে রাজি আছে?"

রত্নাকর বলল—"রাজি আছি। কিন্তু সেখানে আর কেউ থাকবে না—" তাপ্তি সন্তুষ্ট হল না এ প্রস্তাবে। কিন্তু রাজি হতে হল তাকে। অম্বুধি রত্নাকরের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবাইকে সে ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল বন্ধ করে দিল রত্নাকর। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে খিল খুলল। অম্বুধি বলল—"এ পেটের ব্যাথার সঙ্গে মনের যোগ আছে। রাজবৈদ্যের ওষুধ খেলে এবং রাজ দর্শন করলে ভালো হয়ে যাবে। মহেশ্বর অঞ্চলের রাজা পৃথ্বীপতি শঙ্কর দাস রত্নাকরের বন্ধু। তার রাজধানী হিরণ্ময়ী নদীর উপর। রত্নাকর নিজের ময়ূরপংখী করে সেখানে চলে যাক।" অম্বুধি জোর দিয়ে আবার বলল—"আমার বিশ্বাস এতে অসুখ সেরে যাবে।"

অম্বুধি চলে যাওয়ার পর তাপ্তি বলল—"আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাব।"

"সে কথা তো বলাই বাহুল্য।"

হেসে জবাব দিল রত্নাকর।

"ঠিক তো?"

"ঠিক। কিন্তু তুমি ময়ূরপংখীতে থাকবে। রাজার বাড়ি যাবে না।"

"বেশ। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তো?"

"আসব।"

॥ ৯ ॥

পরদিনই রত্নাকরের প্রধান সহচর পরিচয় পাহাড়ী রাজাকে খবর দেবার জন্য একটি পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নৌকা করে'। সেকালেও বিনা খবরে এবং বিনা অনুমতিতে রাজার কাছে যাওয়া যেত না। বন্ধুবান্ধবেরাও যেতে পারত না। চিঠি লেখারও একটা কেতা-দুরস্ত কায়দা ছিল। সেই কায়দা অনুসারেই রত্নাকর লিখল—

মহামহিম মহিমার্ণব
শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা পৃথ্বীপতি
প্রবল প্রতাপেষু,
সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে নিবেদন,
পত্রলেখক আপনার দর্শন-প্রার্থী।
অনুমতি দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিবেন। নিতান্ত প্রয়োজন।
শতকোটি প্রণাম।

সেবক
শ্রীরত্নাকর বণিক।

রাজার জন্য নানারকম উপঢৌকন নিয়ে প্রকাণ্ড একটা বজরা করে' যাচ্ছিল পরিচয় পাহাড়ী হিরণ্ময়ী নদীর উপর দিয়ে। হিরণ্ময়ী নদী মহেশ্বর অঞ্চলের শ্মশানের পাশ দিয়ে বয়ে চলে' গেছে রাজ-ভবনের দিকে।

বজরার মাঝিরা গান গাইছিল, দাঁড় টানছিল, যদিও তখন রাত দুপুর। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। অভিজ্ঞ নাবিক পরিচয় পাহাড়ী বসেছিল হাল ধরে'। হাওয়ায় ফুলে উঠেছিল চারখানা পাল।

বজরা বেশ জোরেই চলছিল কিন্তু শ্মশানের কাছে এসে থেমে গেল হঠাৎ। পাল চুপসে গেল। মাঝিরা বলল, দাঁড় নড়ছে না, প্রত্যেকটি দাঁড় পাথরের মত ভারি হয়ে গেছে। পরিচয় পাহাড়ী বড় বড় নদী পার হয়েছে, সমুদ্র পার হয়েছে। নানারকম নৌকোয় নানা দেশ ঘুরেছে সে, তার চুল পেকে গেছে, কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয় নি। সিঁড়ি বেয়ে বজরা থেকে নেমে পড়ল সে। নেমেই বুঝতে পারল শ্মশানের ধার দিয়ে যাচ্ছে তারা। শ্মশান নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ হাঁটার পর অনেক দূরে সে আলো দেখতে পেল। মনে হ'ল চিতা জ্বলছে বোধ হয়। কাছে গিয়ে দেখল চিতা নয়। চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে উলঙ্গিনী ভোগবতী বসে আছে সর্বাঙ্গে ছাই মেখে। পরিচয় বুঝল ভোগবতীই কিছু করেছে। অঙ্কি আর ভোগবতীকে এ অঞ্চলে সবাই চেনে, সবাই ভয় করে। অসাধ্য সাধন করতে পারে তারা। সে হাত জোড় করে প্রণাম করল ভোগবতীকে।

"ঠাকরুণ আমাদের নৌকো কি আপনিই থামিয়ে দিয়েছেন ?"

"তোমার নৌকো থেকেই কি অত শব্দ হচ্ছিল নাকি ? গান গাইছিল কারা ?"

"মাঝিরা—"

"ছপাৎ ছপ শব্দ হচ্ছিল কিসের ?"

"দাঁড়ের···।"

"এখন কোনও শব্দ করা চলবে না। অঙ্কি শবাসনে ধ্যান করছে। শব্দ করলে ধ্যান ভেঙ্গে যাবে। আর তাহলেই মহা মুশকিল—"

"কেন কি হয়েছে—"

"কাল রাত্রে প্রকাণ্ড একটা হাঁস এসে বসেছিল মন্দিরের উপর। ব্রহ্মার হাঁস। আজ দেখছি মহেশ্বর মন্দির থেকে অন্তর্দ্ধান করেছেন। অঙ্কি শবাসনে বসে' ধ্যানে জানতে চাইছে কেন এরকম হোল। এখন গোলমাল করা চলবে না।"

পরিচয় বলল—"আমি রত্নাকরের একটা জরুরি চিঠি নিয়ে মহারাজ পৃথ্বীপতির কাছে যাচ্ছি। আমার বজরাটাকে ছেড়ে দিন। আমরা নিঃশব্দে পার হয়ে যাব। শুধু পালের জোরেই পেরিয়ে যাব, আপনি হাওয়াটাকে একটু ছেড়ে দিন।"

পরিচয় পাহাড়ীর বয়স যদিও ষাট পেরিয়েছে, পাক ধরেছে চুলে তবুও এখনও সে শক্তিমান। উলঙ্গিনী ভোগবতীকে দেখে তার মনে একটু রিরংসার ভাব জাগল।

ভোগবতী হেসে বলল—"চোখ দুটো কানা করে' দেব এখুনি। শিগগির পালা। বোকা পাঁঠা কোথাকার—"

পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"হাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি। গোলমাল না করে' বিদেয় হ—"

হন হন করে চলে গেল পাহাড়ী। বজরায় উঠে দেখল হাওয়া বেশ জোরে উঠেছে। ফুলে উঠেছে পাল চারটে। নিঃশব্দ গতিতে এগিয়ে চলল তার বজরা রাজপুরীর দিকে।

চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে ভোগবতীও তপস্যা করছিল। সে তপস্যা করছিল কবে কি করে সে পাতালে যাবে। আলোর স্বচ্ছতা আর ভালো লাগছে না তার। স্পষ্টতা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে তার কাছে। অন্ধকারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, অতল কালোর রহস্যের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যেতে চায় সে। কিন্তু অব্ধিকে যে ছেড়ে যেতে পারছে না। অব্ধি বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু নিষ্ঠুর বলেই মনোহর। তার প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় সে। কিন্তু সে প্রহারে কি যে আনন্দ তা বলে' বোঝানো যায় না। সে-ও যখন অব্ধিকে আঘাত করে অব্ধিও রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে পুলকে। সে অব্ধিকে যত আনন্দ দিতে পেরেছে তার সাতাশটা বউ তা দিতে পারে নি। তারা সব ছিল পানসে, জোলো, নিষ্প্রাণ মাংস পিণ্ড সব। বাঘের সঙ্গিনী বাঘিনী, সর্পের সঙ্গিনী সর্পিনী হতে পারে নি। অব্ধি বাঘ, আব্ধ সাপ। ওরা সবাই

বেমানান হয়ে ছিল, তাই একে একে পালিয়ে গেছে। ভোগবতীর মনও পালিয়ে গেছে পাতালের দিকে। কিন্তু অন্ধিকে ছেড়ে সে যাবে কেমন করে'। যখনই সে অবসর পায় তখনই তাই সে তপস্যা করে ভগবান, অন্ধির মোহ থেকে মুক্ত কর আমাকে। আমি পাতালের রহস্যে বিলীন হতে চাই। অন্ধির ক্ষমতার উৎস মহাকাল মহেশ্বর। কিন্তু ভোগবতী জানে ভোগবতীর সাহায্য ব্যতীত সে উৎসে অন্ধি পৌঁছতে পারবে না। ভোগবতী অন্ধিকে বহন করে' নিয়ে যায় সেখানে, কিন্তু কেমন করে নিয়ে যায়, তার চোখের দৃষ্টিতে, তার দেহের ভঙ্গিমায় তার আলিঙ্গনের মদিরায়—কোথায় সে রহস্য লুকিয়ে আছে তা ভোগবতীও জানে না। শুধু এইটুকু জানে অন্ধি যখন তপস্যা করে তখন তাকে কাছে বসে থাকতে হয়। ভোগবতীর সান্নিধ্য অন্ধির প্রয়োজন।

ভোগবতী বসে বসে তপস্যা করতে লাগল।—আমাকে অন্ধির মোহপাশ থেকে মুক্ত কর। হে মহেশ্বর, আমাকে পাতালে নিয়ে চল। আলোর স্পষ্টতায় তোমাকে আমি পাই না, অন্ধকারের নিবিড়তায় তোমাকে আমি পাব। অন্ধকারের দেবতা তুমি, তোমাকে আলোয় পাওয়া যায় না।

হঠাৎ তার মাথার উপর পাখা মেলে বিরাট একটা শাদা পেঁচা উড়তে লাগল। উড়তে উড়তে বলতে লাগল—আমি অন্ধকারের প্রাণী তাই বোধহয় জানি—অন্ধকার অস্পষ্ট নয়, অন্ধকারেও দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া না গেলে আমরা বাঁচতাম না। তুমি আলোর প্রাণী তুমি অন্ধকারে আসতে চাইছ কেন? তুমি বলছ আলো বড় বেশী স্বচ্ছ? আমার কাছে আলো তো স্বচ্ছ নয়। তোমাকে বারণ করছি ভোগবতী অন্ধকারের রাজত্বে তুমি এসো না। অন্ধকার রাজ্যে অন্ধকারের প্রাণীরা গিজ-গিজ করছে, বাইরের লোকের সেখানে স্থান নেই। তুমি এসো না।

চীৎকার করে উঠল ভোগবতী—"তুই দূর হ, দূর হ দূর হ"—ধুনীর একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

চলে গেল পেঁচাটা।

হঠাৎ অঙ্কি এসে হাজির হল। বলল—"মহেশ্বর সুমেরু পর্বতে গেছেন। দেবতাদের আর দৈত্যদের সভা হচ্ছে। সেখানে সভা শেষ হয়ে গেছে। মহেশ্বর এখনই ফিরবেন।"

"কিসের সভা?"

"তা মহেশ্বর জানেন। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। কি খাই বল তো?"

"জানতাম তোমার ক্ষিদে পাবে। চাঁহুর ভাঁটিতে খবর দিয়েছি মাংস আর কারণ রাখতে। চল তাহলে সেখানেই যাই—"

হঠাৎ অঙ্কি গালটা টিপে দিলে ভোগবতীর।

"মাংস, মাংস, মাংস—কেবল মাংসের লোভ—।"

অঙ্কির বুকে একটা ঘুসি মেরে সরিয়ে দিলে তাকে ভোগবতী তারপর ছুটতে লাগল। অঙ্কিও ছুটতে লাগল তার পিছু পিছু।

শ্মশানের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দু'জনে।

॥ ১০ ॥

আকাশ মেঘ-মেদুর সেদিন। গুরু গুরু শব্দ হচ্ছে। এলোমেলো হাওয়া বইছে একটা। তাপ্তির পরিচারিকা পদ্মা কাপড় পাট করছে। তার অন্তরও গুরুগুরু করছে। সে জানে, সে বুঝতে পারে রত্নাকর তাকে ভালোবাসে। রত্নাকর কিছু বলেনি, কিন্তু সে জানে, সে জানে, সে জানে।

আকাশের মেঘ কেটে গেল, বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। চারদিক ভিজে ভিজে। মেঘের ফাঁক থেকে সূর্য উঠছে সোনালি আলো ছড়িয়ে, সেই সোনা চকচক করছে সর্বত্র। জলে, স্থলে, গাছের পাতায়, ফুলের পাপড়িতে, আকাশের নীলে, মেঘের স্তূপে। জলধি কবিরাজের স্ত্রী নর্মদার মনেও। রত্নাকরের কথা ভাবছে সে। রত্নাকর যে দুল-জোড়া এনে দিয়েছিল তাকে, চকচক করছে সে দুটোও। সে চ্যবনপ্রাশ তৈরির আয়োজন করছিল। মনটা কিন্তু পড়েছিল রত্নাকরের কাছে। তার বিদ্বান স্বামীকে সে ভক্তি করে, তার সব আদেশ পালন করে, কিন্তু রত্নাকরকে সে ভুলতে পারে না। ওর হাসিতে, চাহনিতে, ব্যবহারে কি যে একটা আছে যা আর কোথাও নেই। রত্নাকর মুখে কিছু বলেনি, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি যা বলেছে, তা শুনেছে নর্মদা। তার বন্ধ ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, আকাশের একটা টুকরো। নর্মদার মনে হচ্ছিল রত্নাকর তার বদ্ধ জীবনে ওই আকাশের টুকরোর মতো। অসীমের ইঙ্গিত বহন করে' আনে, উন্মনা করে দেয়, কিন্তু নাগালের বাইরে।

সূর্য অস্ত গেছে মেঘের স্বর্ণ-স্তূপের মাঝে। স্বর্ণস্তূপকে ঘিরে কমলা রঙের উৎসব হচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অপরূপ একটা আলো। ত্রিবেণী সঙ্গমের মন্দিরে পুজো করছিল ব্রাহ্মণী। পুজো সেরে বেরিয়ে এসেই সে এই আলো দেখে মুগ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা তার একজনকে মনে পড়ল। গুরুদেব অর্ণবকে নয়, স্বামী পারাবারকে নয়, মনে পড়ল রত্নাকরকে। রত্নাকরের উপহার বস্ত্রটি পরেই সে রোজ পূজা করে। এখনও করছিল। এই অপরূপ আলোয় সে কাষায় বস্ত্রেও যেন একটা নূতন রং লাগল। ব্রাহ্মণী রূপসী। মনে হল আলোর-বসন-পরা এক অপ্সরী যেন আকাশের দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে আছে। সে তার স্বামী পারাবারকে ভালোবাসে। সে তার প্রেমিক। সে কবি। রোজই তাকে নিয়ে কবিতা লেখে। কাল লিখেছে—

তোমার মিষ্টি হাসির চমক
দীপক রাগের গানের গমক
তোমার চলার ভঙ্গীতে যে
খঞ্জনদের চলার চমক।

সে গুরুদেব অর্ণবকেও ভক্তি করে। অর্ণব সত্যিই ভক্তি ভাজন। কিন্তু তবু অপরূপ আলোয় তার মনে পড়ল রত্নাকরকে। রত্নাকর গুরু নয়, রত্নাকর কবি নয়, রত্নাকর এই আলোর আভা।

থমথম করছে অন্ধকার রাত্রি। জ্যোতিষী অম্বুধি বসে আছে উঠোনে আকাশের দিকে চেয়ে। চেষ্টা করছে পুষ্যা নক্ষত্রটাকে দেখতে। পুষ্যা নক্ষত্র বড় অস্পষ্ট। একটা ছোট্ট ধোঁয়ার কুণ্ডলী অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কি যেন একটা রহস্য আছে ওর মধ্যে। রোহিনী বা আর্দ্রার মতো স্পষ্ট নয়। পুষ্যা তার জন্ম নক্ষত্র। কোষ্ঠি থেকে মনে হয় তার অপঘাতে মৃত্যু হবে। সেই

মৃত্যুটাকে সে প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করে ওই রহস্যময় কুণ্ডলীর মধ্যে।

ইরাবতী ঘরে একা বিছানায় শুয়ে কাঁদছে। রোজই সে একা শোয়। অম্বুধি তার কাছে শোয় না। অম্বুধি অসমর্থ। কিন্তু এই অসমর্থ স্বামীকে ইরাবতী ছেড়ে যায় নি। দেহে সে অসমর্থ, কিন্তু কি বিরাট তার প্রতিভা। অথচ একেবারে শিশুর মত। ইরাবতী তাকে খাইয়ে দেয়, নাইয়ে দেয়! ইরাবতী অম্বুধির মা। সন্তানকে ছেড়ে সে যাবে কি করে? অম্বুধি তার প্রাণ। কিন্তু মানুষের মনের ক্ষুধা এক রকম নয়। নারী মা হতে চায়। প্রিয়াও হতে চায়। যে ইরাবতী প্রিয়া হতে চায় সে কিন্তু আজও একাকিনী। শুধু একাকিনী নয়, মনে মনে সে গভীর অন্ধকারে চির-অভিসারিকা। অন্ধকারে সে মনে মনে হাঁটছে, কেবল হাঁটছে। পার হচ্ছে প্রান্তর মরু নদী পর্বত। কিন্তু সে জানে তার প্রেমাস্পদকে সে কোনদিন পাবে না। রত্নাকর লুব্ধক নক্ষত্র। প্রোজ্জ্বল, প্রদীপ্ত—কিন্তু বহু দূরের। তাপ্তিও তাকে পায় নি। ইরাবতী জানে সে-ও তাকে পাবে না। কিন্তু সে তার দিকেই চলেছে। মনে মনে। অন্ধকার রাত্রে একা ঘরে এসে সে যখন শোয় তখন সে অসম্ভবকেই প্রত্যাশা করে। কিন্তু অসম্ভব কখনও সম্ভব হয় না। রত্নাকর কোনও দিন আসে না। ইরাবতী কিন্তু লুব্ধকের উদ্দেশ্যে হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে, ক্রমাগত হেঁটে চলেছে···!

পাশের ঘরে শুয়ে তার বিধবা ভগ্নী কাবেরী কিন্তু ভাবছিল অন্যরকম। তার ধারণা তাপ্তি রত্নাকরকে আগলে আগলে রেখেছে বলে' সে রত্নাকরের নাগাল পাচ্ছে না। একবার নাগাল পেলেই—ব্যস। পুরুষ জাতকে সে চেনে। পুরুষদের সম্বন্ধে একটা ছড়াও বানিয়েছে সে—

বাইরে সবাই হোমরা চোমরা
হোঁৎকা পুরুষ জাত
মেয়েদের নয়ন বাণে
সকলে হয় কাৎ।

রত্নাকর একবার বলেছিল সে যখন নৌবহর নিয়ে বাণিজ্যে বেরুবে তখন আমাদের নিয়ে যাবে। তখন কত বন্দরে ওঠা-নামা হবে, তাপ্তি কি তখন সব সময় আগলে রাখতে পারবে তাকে? পারবে না। সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে কাবেরী।

রত্নাকরের অসুখটা ভালো হলেই সে বাণিজ্য করতে বেরুবে। তখন···আর ভাবতে পারে না সে।

অন্ধকার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। পূর্বদিকে দেখা দিয়েছে ঊষার আভাস। ফিঙ্গে পাখী অনেক আগেই ঘোষণা করেছে রাত পোহালো। দু-একটা কাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। মন্দাকিনী তার স্বামীর পাদোদক খেয়ে বেরিয়ে পড়ল। স্নান করবে নদীতে গিয়ে। একাই গিয়ে সে স্নান করে রোজ। হিরণ্ময়ী নদীতে গলা ডুবিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। মনে পড়ে পূর্ব জীবনের কথা। সে যে একদিন রাজকন্যা ছিল তা সে ভুলতে পারে নি এখনও। ভোরের আধো-অন্ধকারে হিরণ্ময়ী নদীতে গলা ডুবিয়ে সে দেখে পূর্ব জীবনের অনেক স্মৃতি, অনেক স্বপ্ন। মনে পড়ে তার বাবার কথা, সহচরীদের কথা, তার বাগানটিকে। কত ফুল ছিল সেখানে। হিরণ্ময়ীর তরঙ্গমালা তার কানে কানে যেন বলে তুমি রাজকন্যা, তুমি সন্ন্যাসিনী নও। মন্দাকিনীর মনে হয় হিরণ্ময়ী বলছে। কিন্তু হিরণ্ময়ী বলে না, বলে তার মনেরই একটা অংশ। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অংশ প্রতিবাদ করে—আমি হয়তো সত্যি সন্ন্যাসিনী হতে পারি নি। কিন্তু আর আমি রাজকন্যা নই। রাজকন্যার মৃত্যু

হয়েছে সর্পাঘাতে। অর্ণব আমাকে বাঁচিয়েছে। অর্ণব আমার প্রাণদাতা, আমি অর্ণবের কাছে কৃতজ্ঞ। হিরণ্ময়ীর তরঙ্গ-মালা প্রত্যুত্তর দেয়—তা জানি। কিন্তু তুমি সন্ন্যাসিনী নও। অর্ণবের সহধর্মিণীও নও। সে তোমাকে মন্ত্র দেয় নি, তুমি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে' তপস্যা কর না। অর্ণবের পত্নীও নও, কারণ অর্ণব ঊর্ধ্বরেতা তপস্বী! সে তোমার ঘরে শোয় না, রাত্রেও সে তপস্যায় মগ্ন থাকে একা দ্বীপের উপরে। অর্ণব জানে তুমি তপস্যা করতে পারবে না, তাই সে তোমাকে নিজের খুশী মতো চলতে দিয়েছে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী—হিমালয়ের তিন কন্যা—অর্ণবের অনুরোধে মহাদেবের আদেশে এসেছে এখানে তোমার সেবা করবার জন্যে তা কি বুঝতে পার না? ওরা কি সাধারণ চাকরানীর মত? ওরা যে সুরে কীর্তন গায় সে সুর কি মানবীর কণ্ঠে সম্ভব? ওরা তোমার সঙ্গে যখন মাঠে কাজ করে তখন লক্ষ করেছ কি কত তাড়াতাড়ি কত নিপুণভাবে কাজ করে ওরা? ওরা যদি সাধারণ জন-মজুর হত তাহলে এমন পারত কি? মাঠের প্রসঙ্গ উঠলেই রত্নাকরকে মনে পড়ে। সে যদি অতখানি জমি না দিত কি করত মন্দাকিনী? রত্নাকরের কাছেও মন্দাকিনী কৃতজ্ঞ। রত্নাকরের প্রতি কৃতজ্ঞতা আর অর্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতা—এই দুই কৃতজ্ঞতার কি কোনও তফাত নেই? আছে। কিন্তু মন্দাকিনী সেটা নিজের কাছেও স্পষ্ট করে বিশদ করতে চায় না। তফাত রঙের। অর্ণবের প্রতি কৃতজ্ঞতার রং ধপধপে সাদা, আর রত্নাকরের প্রতি কৃতজ্ঞতাটা গোলাপী রঙের। কিন্তু সেটা মন্দাকিনী নিজে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়। স্নান করে' সে যখন মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করে তখন বার বার বলে—আমি কিছু চাই না। আমি কিছু চাই না, আমি তাকে স্পর্শও করতে চাই না, তাকে দেখতেও চাই না, তুমি শুধু তার মঙ্গল কর, তার যেন কোনও বিপদ না হয়। প্রার্থনার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সে ঢেকে দিতে চায় ওই গোলাপী রং-টাকে। সেটা ঢাকা পড়ে, কিন্তু লুপ্ত হয় না।

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী—অপরূপা কন্যা তিন জন। তারা প্রায়ই রত্নাকরকে কীর্তন শোনাতে যায়। রত্নাকরকে ঘিরে তাদের মন যেন ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তারা ঝর্ণার মতোই নির্বিকারও। তারা তিনজনই যেন এক প্রকৃতির। কোথাও আটকে পড়ে না, কাউকে আঁকড়ে ধরে না। তারা জলের মতোই তরল, কিন্তু তারা ডোবার জল নয়। রত্নাকর তাদের খুব প্রিয়। কিন্তু রত্নাকরের অভাবে তাদের জীবন শূন্য হয় না, ব্যর্থ হয় না, থেমে যায় না। তারা সদা-প্রবাহিনী। তারা যখন রত্নাকরের কাছে যায় তখন তাপ্তির মুখে মেঘ ঘনিয়ে আসে। সে মুখে যদিও ভদ্রতা করে কিন্তু তার মনে মনে অস্বস্তি। তার বাইরে ভদ্রতা আর ভিতরে অস্বস্তির কথা টের পায় তারা। টের পেয়ে কৌতুক বোধ করে। রত্নাকরকে সে একা ভোগ করবে? যা সুন্দর তাকে কি একা ভোগ করতে পারে কেউ? আকাশ কি কারো একার সম্পত্তি হতে পারে? গঙ্গা যখন শিবের জটাজালে ছিল তখন কি উমা আপত্তি করেছিল? যমুনা যে যমুনোত্রীর আশ্চর্য প্রকাশ সে যমুনোত্রী কি যমুনার একার? সে তো হিমালয়ের অংশ। কত মেঘ, কত তুষার, কত আলো, কত বর্ণ অলঙ্কৃত করেছে তাকে। যমুনা জানে যমুনোত্রী তার একার নয়, সকলের। ব্রহ্মার মানসী সরস্বতীও যে ব্রহ্মা তার একার নয়। সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার দিকে কোটি কোটি লোকের মুগ্ধ দৃষ্টি বহুবর্ণ আলোর মতো অহরহ পড়ছে। তাকে ঘিরেও কত ঋষির, কত গুণীর, কত কবির স্তব গুঞ্জিত হচ্ছে অহরহ। সে-ও কারো একার নয়।

কৌতূহলী মন্দাকিনী বার বার তাদের প্রশ্ন করে—তোমরা কে? তারা তাকে বলে আমরা হিমালয়ের কন্যা। এর বেশী আর কিছু বলে নি। মন্দাকিনীর মনে সত্যটা ধরা পড়েছে কিন্তু। সে বুঝতে পেরেছে তার জন্যই অর্ণব আনিয়েছে এদের। অর্ণবের অনুরোধেই

মহেশ্বর এদের পাঠিয়েছেন। কেন মহেশ্বরকে অনুরোধ করেছে অর্ণব? কেন সে তাকে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্র সাধন করতে দেয় নি? কেন সে তাকে অনুকম্পা করছে? এসব প্রশ্নের উত্তর সে পায় নি। অর্ণবকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় নি। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কিন্তু মন্দাকিনীর মনের সব খবর জানে। এমন কি সেই গোলাপী রং-এর খবরটাও জানে। জানবেই তো। তারা যে দেবকন্যা। তারা সব জানে। কিন্তু কিছু বলে না।

দিগন্ত রেখায় কিছু মেঘ অনেকক্ষণ থেকেই ছিল। স্বপ্ন দেখছিল তারা। ক্রমশ তাদের স্বপ্ন যেন রূপায়িত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে কে যেন লাল আবীর বর্ষণ করতে লাগল তাদের উপর। রক্তিম হয়ে গেল মেঘমালা। কালো, সাদা, পাঁশুটে সকলেরই সর্বাঙ্গে ফুটল এক অপরূপ রক্তিম জ্যোতি। মনে হল কে যেন আসছে, তারই নীরব জয়ধ্বনি উঠেছে মেঘে-মেঘে। তারপর অলক্ষ থেকে রাশি রাশি স্বর্ণরেণু যেন এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই রক্তিমার উপর। শুধু ঝাঁপিয়ে পড়ল না, সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে গেল, পরিণত হল রক্তাভ স্বর্ণ-সমুদ্রে। তারপর সেই সমুদ্রে জাগল কত রঙের, কত আকারের দ্বীপ। বর্ণময় একটা মহাদেশ যেন, স্বপ্নের দেশ। তারপর সহসা সমস্তটা ফেটে গেল। সূর্যোদয় হল। জবাকুসুমসঙ্কাশ ধ্বন্তারি সূর্যদেব আলোর প্রপাতে যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সব।

বিতস্তা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। রোজই দেখে। রোজই ভিন্ন ছবি দেখে। কিন্তু রোজই দেখে সূর্য উঠছে। মনে পড়ে আর একজনের কথা। এই দেখার মধ্য দিয়েই রোজ সে অর্ঘ্য পাঠায় তাকে। সে তার স্বামী সাগর নয়, তার স্বামীর বন্ধু রত্নাকর। রত্নাকর প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন নয়, রত্নাকর প্রভাতের উদীয়মান তপন, বর্ণ-বিভূষিত স্বর্ণকমল। সে দিগন্তের ওপারে থাকে। সে বহুদূরের।

সাগর কাছের। সাগর বলবান। রত্নাকর রূপবান। সাগরের শক্তিতে সে বিস্মিত হয়, কিন্তু মুগ্ধ হয় রত্নাকরের রূপ দেখে। সাগরের উত্তুঙ্গ শক্তি শিখরের উপর দাঁড়িয়ে সে চেয়ে থাকে রত্নাকরের দিকে। সাগর এ কথা জানে। রাগ করে না, কারণ সে-ও মুগ্ধ। রত্নাকরের অনিবার্য আকর্ষণ সে স্বীকার করে। তাই সে রাগ করে না। সে শক্তির আধার, শক্তির উপাসক, তাই তার ঈর্ষা নেই। যারা ক্ষুদ্র, যারা দুর্বল, যারা নীচ তারাই ঈর্ষা-ক্লিষ্ট হয়। শক্তিমান সাগর শক্তির মহিমায় মহিমান্বিত। শক্তির তুঙ্গলোকে তার আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ। ঈর্ষা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। বিতস্তা সাগরের বৃহত্ত্বকে আজও আয়ত্ত করতে পারে নি। পর্বতারোহীর মতো সে কেবল উঠেই চলেছে। সমস্ত পর্বতটা সে দেখতে পায়নি এখনও।

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা চতুর্দিকে। রত্নাকরের বাড়ির পাশে প্রকাণ্ড যে শিরীষ গাছটা আছে তারই উপর উঠে বসে আছে ফল্গু। সেখান থেকে রত্নাকরের শোবার ঘরটা দেখা যায়। সেখান থেকে সে দেখছে রত্নাকর শুয়ে আছে। আর তাপ্তি হাওয়া করছে তাকে। সে বুঝতে পেরেছে তাপ্তি তাকে সহ্য করতে পারে না। তাই সে আজকাল আর যায় না রত্নাকরের কাছে। কিন্তু সে তাকে না দেখে থাকতে পারে না। সে যে তার কাকাবাবু। শুধু কাকাবাবু নয়, সে তার জীবনে একমাত্র পুরুষ। সে অনেক পুরুষ দেখেছে কিন্তু এমন নির্মল, নিষ্কলুষ সুন্দর পুরুষ আর দেখে নি। তার মনে হয় একটা স্বপ্ন যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। তাপ্তি তার যাওয়াটা পছন্দ করে না, কিন্তু দেখাটা বন্ধ করতে পারে নি। শিরীষ গাছের ডালপালার আড়ালে বসে ফল্গু গুনগুন করে গান গাইছে, আর দেখছে, কেবল দেখছে। তার সমস্ত সত্তা

যেন তার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে গিয়ে স্পর্শ করছে রত্নাকরকে। আর সেই স্পর্শের আনন্দ ভাষা পাচ্ছে তার গানে।

"ফলি তুই কোথা—"

ভিনটির আকুল কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

চুপটি করে বসে আছে ফল্গু। বসে আছে স্বপ্নলোকে, যেখানে ভিন্টিরা পৌঁছতে পারে না।

তাপ্তি ঘরের মধ্যে খিল দিয়ে বসে আছে। সে ঠিক করেছে আর কোনও মেয়েকে রত্নাকরের কাছে যেতে দেবে না। রত্নাকর শুয়ে আছে পাশের ঘরে। তাপ্তির ঘর না পেরিয়ে রত্নাকরের ঘরে যাওয়া যায় না।

গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। রত্নাকর ঘুমুচ্ছে। অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদের রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ঘুমন্ত রত্নাকরের মুখে একটা প্রসন্ন মৃদু হাসি। মনে হচ্ছে না তার কোনও অসুখ করেছে।

পাশের ঘরে তাপ্তি পাহারা দিচ্ছে খিল দিয়ে। কাউকে ঢুকতে দেবে না সে। বেশী ভয় পদ্মাকে। কপাট খোলা পেলেই কোন না কোন ছুতোয় ঢুকবে এসে।

বিকেলের লাল আলোয় তারও ঘরটা ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে এটা আলো নয়, যেন আরো কিছু। এমন আলো তো আর কোনও দিন দেখে নি সে। মনে হল কার অন্তরের কামনা যেন রূপ ধরেছে

হঠাৎ ভোগবতী এসে দাঁড়াল। উলঙ্গিনী। চমকে উঠল তাপ্তি।

"ঘরে খিল লাগিয়েও আমাকে আটকাতে পার নি। আমি এসে গেছি—।"

তারপর খিল খিল করে হেসে উঠল সে। তার স্তন যুগল, তার মাংসল নিতম্ব, তার সমস্ত যৌবন যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"কি করে এলে তুমি"—সভয়ে চীৎকার করে' উঠল তাপ্তি।

"কি করে তা তোমার মাথায় ঢুকবে না। আমি এসেছি তোমার রত্নাকরকে গ্রাস করব বলে' সন্দেশের মত টপ করে মুখে ফেলে দেব বলে'।"

"দোহাই তোমার, ও-ঘরে যেও না। ও-ঘরে যেও না—ও ঘুমুচ্ছে—" দুটো ঘরের মাঝখানে যে কপাট ছিল তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তাপ্তি দু-হাত বিস্তার করে। ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সে। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তার দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ভোগবতী। তারপর সেও হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বলল—"তাপ্তি তোর দুঃখ আমি বুঝেছি। তুই কিন্তু আমার দুঃখ বুঝলি না। আমি তোকে বলতে এসেছিলাম ঘরে খিল এঁটে তুই রত্নাকরকে রক্ষে করতে পারবি না। রত্নাকর নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে। আমি তোকে ভয় দেখাতে এসেছিলাম। আমার খুব লোভ আছে ওর প্রতি। কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি না। আমি ভালোবাসি অন্ধকারকে। রত্নাকর আলো। ওকে পাবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি পাতালে যাব।"

সহসা অন্তর্দ্ধান করল সে।

॥ ১১ ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তিন্তিড়ীর বিখ্যাত গাঁজার দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রহরের শেষে শেয়ালরা যখন ডেকে ওঠে তখন তিন্তিড়ী এক ছিলিম গাঁজা খেয়ে দোকান বন্ধ করে দেয়। গাঁজা খেয়ে ধ্যানে বসে সে। মহাভক্ত লোক তিন্তিড়ী কুম্ভকার। তার পূর্বপুরুষরা সকলেই কুম্ভকার ছিলেন। তিন্তিড়ী কিন্তু একজন শৈব সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিয়ে শিব-ভক্ত হয়েছে। গুরুর পরামর্শেই তিন্তিড়ী কৌলিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে গাঁজার আর সিদ্ধির দোকান করেছে। গুরুর কৃপায় ব্যবসা ভালোই চলছে। রত্নাকর তার ব্যবসাতে খুব সাহায্য করে। যেখানে ভালো গাঁজা, ভালো সিদ্ধি পায় কিনে নিয়ে আসে তার জন্যে। একবার কোন এক দ্বীপ থেকে শিবের জটার মত যে গাঁজা এনেছিল তা অপূর্ব। সেই গাঁজা এনে এখানেও চাষ করছে সে।

সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর যখন সে ধ্যানে মগ্ন, তখন তার দুয়ারে টোকা পড়তে লাগল। সবাই জানে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর তার দোকান খোলা থাকে না,—তবু টোকা দিচ্ছে কে? বিরক্ত হল মনে মনে, তবু উঠে কপাট খুলে দিলে সে। দিয়ে চমকে উঠল। যিনি দুয়ারের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি তো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর গা দিয়ে আলোর আভা বেরোচ্ছে—মাথার পিছনে একটা জ্যোতির্মণ্ডল। এক হাতে প্রকাণ্ড কমণ্ডলু। অন্য হাতে ত্রিশূল। তাকে তিন্তিড়ী স্বয়ং মহেশ্বর বলেই মনে করত, কিন্তু তার কুচকুচে কালো রং আর চাপ চাপ দাড়ি গোঁফ দেখে ভড়কে গেল সে। মহেশ্বরের চেহারা তো এরকম হতে পারে না। তবু তিন্তিড়ী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

লোকটি তখন বলল—"আমার গাঁজার কলকেটি পড়ে গেছে। এক ছিলিম গাঁজা খাওয়াতে পারবে আমাকে? আপনার সমস্ত পরিচয় আমি জানি, আপনি শুধু গঞ্জিকা বণিক নন, আপনি মস্ত একজন শিবভক্ত, সে কথা আমি জানি। রোজই আপনাকে আমি দেখি। এতদিন আত্মপ্রকাশ করবার প্রয়োজন হয় নি। আজ হয়েছে। এক ছিলিম গাঁজা খাওয়ান আমাকে— ।"

তিন্তিড়ী অবাক হয়ে গেল একটু। ইনি রোজ দেখেন আমাকে? আশ্চর্য। সে কিছু না বলে গাঁজা সাজতে বসল।

"আপনি ভিতরে এসে বসুন।"

লোকটি ভিতরে এসে একটি আসনে উপবেশন করলেন।

গাঁজার ছিলিমটি তার হাতে দিয়ে তিন্তিড়ী বলল—"আপনার পরিচয় কি?"

"পরিচয়? পরিচয় জেনে কি করবে? ভয় পাবে।"

"আমার কোন ভয় নেই।"

"ভয় নেই? কেন?"

"আমি কোনও পাপ করি নি।"

লোকটি গাঁজায় একটা টান দিয়ে ভম্ হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

ধোঁয়া ছেড়ে প্রসন্ন মুখে চেয়ে রইল লোকটি তিন্তিড়ীর দিকে।

"না, তোমার গাঁজায় কোন ভেজাল নেই। তুমি পাপী নও।"

"আপনার পরিচয়টা দিন।"

"আমি ভৃঙ্গী।"

ভৃঙ্গী? মহেশ্বরের প্রধান অনুচর? সাষ্টাঙ্গে আবার প্রণাম করল তিন্তিড়ী।

"আমি ধন্য। আমার কুটির আজ ধন্য। আপনি এখানে কেন এসেছেন?"

"আমি রোজ আসি।"

"কেন?"

"আপনারা যখন মহেশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যান, আমি তখন সে মন্দিরে অদৃশ্য ভাবে থাকি। আপনারা কে কি প্রার্থনা করেন তা শুনি। তারপর লিপিবদ্ধ করে রাখি এই কমণ্ডলুর মধ্যে। তারপর মহাদেবকে সেগুলি শোনাই—।"

"মহাদেব নিজে শোনেন না?"

"তিনি সর্বদাই সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তখন তিনি কিছু শোনেন না। সমাধি ভঙ্গ হলে কৈলাসে চলে' যান তিনি। তখন আমি তাঁকে আপনাদের প্রার্থনা শোনাই—"

"তাই না কি।"

"হ্যাঁ, আমার কাজই তো আপনাদের প্রার্থনা তাঁর কানে পৌঁছে দেওয়া।"

"আশ্চর্য! এ তো কল্পনা করি নি কখনও।"

ভৃঙ্গী হাসি মুখে চুপ করে রইলেন।

"আমাদের প্রার্থনার কোনও বৈশিষ্ট্য দেখেছেন কি?"

"প্রচুর। আধিকাংশ লোকের প্রার্থনা দু'দিন এক রকম হয় না! আজ বলছে আমার অসুখ সারিয়ে দাও, কাল বলছে আমার জমিতে যেন বেশী ধান হয়, তার পরদিন বলছে, রাজদ্বারে একটা মকোর্দমায় পড়েছি আমাকে জিতিয়ে দাও। তবে এ অঞ্চলের সাতজন লোক একই প্রার্থনা রোজ করে না।"

"কে তাঁরা?"

"তা এখন বলব না। আচ্ছা উঠি এখন।"

ভৃঙ্গী অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিন্তিড়ী সবিস্ময়ে দেখল তার মাটির কলকেটা সোনার হয়ে গেছে।

পরিচয় পাহাড়ী মহারাজ পৃথ্বীপতির উত্তর নিয়ে ফিরে এসেছে। পৃথ্বীপতি সুগন্ধী ভূর্জপত্রে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন।

বিবিধগুণ-মণ্ডিত বন্ধু শ্রীযুক্ত রত্নাকর বণিক মহাশয়,

আপনি আগামী পূর্ণিমায় আমার এখানে আসুন। আপনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।

আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

শুভাকাঙ্খী
পৃথ্বীপতি

চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হল রত্নাকর। পরিচয় পাহাড়ীকে বজরা সাজাতে বলল।

"তোমার মা-ও আমার সঙ্গে যাবেন। ময়ুরপংখীতে তাঁর থাকবার জন্যেও যেন সব ব্যবস্থা থাকে।"

তাপ্তিকে বলল—"তোমায় কিন্তু ময়ূরপংখীতে থাকতে হবে। রাজা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তোমাকে করেন নি।"

"তুমি রাজার কাছে কতক্ষণ থাকবে? আমি বেশীক্ষণ তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না কিন্তু।"

"কতক্ষণ থাকতে হবে তা তো জানি না। রাজবৈদ্য আমাকে দেখবেন। কতক্ষণ লাগবে কি করে বলব। তবে ইচ্ছে করে দেরি করব না। কাজ শেষ হলেই চলে' আসব।"

পূর্ণিমার দিন সকালে রত্নাকরের সুসজ্জিত ময়ুরপংখী ভিড়ল রাজভবনের ঘাটে। দেখা গেল—ঘাট থেকে রাজভবন পর্যন্ত বিরাট একটা মখমলের গালিচা পাতা রয়েছে। গালিচার দুপাশে মঙ্গলঘট

মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত যুবতীরা। স্বয়ং মন্ত্রীমশাই এসেছেন রত্নাকরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য। রত্নাকর অবতরণ করবামাত্র তুর্যধ্বনি হল রাজপ্রাসাদ থেকে, অনেক শাঁখ বেজে উঠল।

মন্ত্রীমশাই বজরায় উঠে অভিবাদন করে বললেন—"আপনার জন্য পালকি এনেছি—।"

ঘাটের কাছে একটি অলঙ্কৃত পালকি অপেক্ষা করছিল।

রত্নাকর তাপ্তির ঘরে ঢুকে বললেন—"আমি ঘুরে আসছি তাহলে—।"

মন্ত্রীমশাই প্রশ্ন করলেন—"আর কেউ আছেন না কি আপনার সঙ্গে ?"

"হ্যাঁ, আমার স্ত্রী এসেছেন।"

"ও তাই না কি। আসুন আপনি।"

রত্নাকর পালকি চড়ে চলে গেলেন। একটু পরেই আর একটি সুসজ্জিত পালকি এল। তাতে এলেন স্বয়ং রাজরাণী। তিনি সমাদরে নিয়ে গেলেন তাপ্তিকে। তাপ্তি চলে গেল একেবারে রাজঅন্তঃপুরে। সেখানে তাকে ঘিরে যে আদর—আপ্যায়নের আতিশয্য শুরু হল তাতে অভিভূত হয়ে পড়ল সে। তবু তার মনে শঙ্কা জাগছিল রত্নাকর কোথা গেল, কোন ঘরে সে আছে। তার খাওয়ার কি ব্যবস্থা করেছে এরা। গুরুপাক খাবার তার পেটে তো সইবে না। জিগ্যেসই করে ফেলল শেষে—"উনি কোন ঘরে আছেন ?"

"উনি আছেন রাজার কাছে। কেন ?"

"ওঁর খাওয়াটা যেন গুরুপাক না হয়। পেটে ব্যাথা কি না—।"

"সব ব্যবস্থা হবে, চিন্তা করবেন না।"

তবু চিন্তিত হয়ে বসে রইল তাপ্তি।

রাজার নিভৃত কক্ষে রত্নাকর বসেছিলেন রাজার সঙ্গে। সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না কেউ।

মহারাজ প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "তোমার বিশেষ প্রয়োজনটা কি ? কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো ?"

"এসেছি অম্বুধি জ্যোতিষীর পরামর্শে। সে আমাকে রাজদর্শন করতে বলেছে, আর রাজবৈদ্যের ওষুধ খেতে বলেছে।"

"তোমার কোনও অসুখ করেছে না কি—" রত্নাকর কোনও উত্তর না দিয়ে হাসি মুখে চেয়ে রইল মহারাজের দিকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন—"এটা প্রচারিত হয়েছে যে আমি পেটের ব্যাথায় ভুগছি। কোনও ওষুধ খেয়ে সারছে না—।"

"প্রচারিত হয়েছে মানে ?"

"আমিই প্রচার করেছি।"

"কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে। তোমার পেটের ব্যথা হয়েছিল নিশ্চয়—।"

"হয় নি।"

"হয় নি, অথচ প্রচার করেছ হয়েছে—এ কি রকম ?"

"মহারাজ আমার আসল রোগ দু'টি। প্রথমত আমি স্ত্রৈণ, দ্বিতীয়ত আমার চক্ষুলজ্জা খুব প্রবল। আমি কারও অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারি না—"

"এতো রোগ নয়। দুটিই মহৎ গুণ—"

"এই দুটি গুণই আমাকে মিথ্যে কথা বলতে বাধ্য করেছে—"

"কি রকম ?"

"গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে। আমার বন্ধুর মেয়ে ফল্গু তার বাগান থেকে এক কাঁদি চমৎকার কলা পাঠিয়েছিল। বলেছিল, এ কলা পাকলেই গন্ধে চারদিক ভরে যাবে। আর তখনই এটা খাবেন। তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম খাব। ফল্গু যুবতী, এবং সুন্দরী। আমাকে সে কাকা বলে ডাকে। কিন্তু আমার স্ত্রী তাপ্তির সন্দেহ অন্যরকম। ফল্গু কদাচিৎ আমার বাড়িতে আসে, কিন্তু এলেই তাপ্তির মুখ অন্ধকার হয়ে যায়। ফল্গুর কলা পাকল রাত দুপুরে—

চারদিক গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তাপ্তিকে ওঠালাম। বললাম—কলা নিয়ে এসো, এখুনি খাব; ফল্গুকে কথা দিয়েছি। তাপ্তির মুখের ভাব যা হল তা অবর্ণনীয়। কিন্তু সে উঠে কলা এনে দিলে আমাকে। তিন-ছড়া কলা। বললাম এসো দুজনে মিলে খাই। সে বলল—আমি খাব না। রেগে পাশের ঘরে চলে' গেল। আমি খেয়ে ফেললাম, চমৎকার কলা। একটি একটি করে আমি তিনছড়া কলাই শেষ করে ফেললাম। তাপ্তি আসছে না দেখে পাশের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি বিছানায় সে উপুড় হয়ে কাঁদছে। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একটা পাখা নিয়ে তার মাথার শিয়রে বসে' হাওয়া করতে লাগলাম। রেগে আমার হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সে। বুঝলাম খোশামোদ করে' তার রাগ ভাঙানো যাবে না। হঠাৎ মনে পড়ল কিছুদিন আগে আমার নাবিক পরিচয় পাহাড়ী খবর এনেছিল যে কোনও এক বন্য মহাদেশে না কি প্রচুর গজদন্ত সস্তায় পাওয়া যায়। ঠিক করে ফেললাম নৌ-বহর নিয়ে সেই মহাদেশের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব। তার সঙ্গে থাকবে আমার ময়ূরপঙ্খী আর তাতে থাকবে আমার স্ত্রী। কথাটা প্রকাশ করে' বলতেই সে হাসি-মুখে উঠে বসল। বলল—সঙ্গে কিন্তু আর কাউকে নিতে পারবে না। থাকব কেবল আমি আর তুমি। বললাম—নিশ্চয়। কিন্তু তখনই মনে পড়ল আর কেউ যদি যেতে চায় তাকে আমি 'না' বলতে পারব কি? পারব না। অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী, জলধির স্ত্রী নর্মদা, অব্ধির স্ত্রী ভোগবতী, পারাবারের স্ত্রী ব্রাহ্মণী, অর্ণবের স্ত্রী মন্দাকিনী, সাগরের স্ত্রী বিতস্তা, ত্রিবেণী সঙ্গমের গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী বন্ধু কন্যা ফল্গু—এরা যদি এসে বলে আমরাও তোমার সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করব—তাহলে তাদের আমি তো 'না' বলতে পারব না। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর। শুধু মধুরই নয়, অতি পবিত্র। তাদের আমি ভালোবাসি, ভক্তি করি,

স্নেহ করি। তাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করা যাবে না। ইতি পূর্বে তাদের অনেককে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে এবার যখন বড় কোন সমুদ্রযাত্রায় বের হব তাদেরও নিয়ে যাব। তাপ্তি কিন্তু তাহলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবে। তাই সমুদ্র যাত্রা স্থগিত রাখার জন্য পেট-ব্যাথার ভান করলুম। এখনও সেই ভান চলছে। তাপ্তি, বৈদ্য, অবধূত, গণৎকার নিয়ে মেতে আছে। আপনি বিজ্ঞ বুদ্ধিমান লোক, এখন কি করে' দুকূল রক্ষা হয় তার একটা উপদেশ দিন আমাকে। মহারাজ হেসে বললেন—"জটটি বেশ পাকিয়েছ দেখছি—" তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

"শ্রীমতি তাপ্তি দেবী তোমার সঙ্গে যাবেনই এবং একা যাবেন—এই তো—?"

"হ্যাঁ, আমি কিন্তু কারো অপ্রিয়-ভাজন হ'তে চাই না—।"

মহারাজ চিন্তিত মুখে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর হাসলেন একটু। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলেন রত্নাকর তাঁর দিকে।

মহারাজ আর একটু হেসে বললেন—"হয়েছে। এইবার রাজ-বৈদ্যকে খবর দেওয়া যাক। তোমাকে চুপি চুপি একটা কথা বলছি, উনি যদি কোনও ওষুধ দেন, খেও না। ওঁর স্মৃতিশক্তি বেশ প্রবল, চিকিৎসা কি করে করতে হয় উনি জানেন না। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্র মুখস্থ করে' আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী হয়েছেন, আর আমার মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে রাজবৈদ্য পদটি বাগিয়েছেন। আমি ওঁর ওষুধ খাই না। তুমিও খেও না। তবু ওঁকে ডেকে দেখা যাক উনি কি বলেন—।"

"বেশ।"

মহারাজা দৌবারিককে আদেশ দিলেন বৈদ্য মহাশয়কে ডেকে আনতে। একটু পরেই রাজবৈদ্য এসে অভিবাদন করলেন মহারাজকে। তাঁর গায়ে নামাবলী, পরিধানে পট্টবস্ত্র, মাথার টিকিতে ফুল; কপালে তিলক।

"কবিরাজ মশাই, আমার বন্ধু রত্নাকরের হাতটা দেখুন তো কি হয়েছে।"

কবিরাজ চোখ-বুজে নাড়ী ধরে বসে' রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর বললেন—"অসুখের তো কোন লক্ষণ দেখছি না। তবে নাড়ী দুর্বল। আপনি কি খান?"

"মৌরলার ঝোল আর ভাত। তার সঙ্গে একটু দুধ—।"

"কেন?"

"আমার পেটে ব্যথা হয়—।"

মহারাজ বললেন—"একটু করে মৃতসঞ্জীবনী সুধা খেলে কেমন হয়—।"

"তা-ও খেতে পারেন।"

"তাই খানিকটা পাঠিয়ে দিন তাহলে।"

"যে আজ্ঞে।"

রাজবৈদ্য বিদায় নিলেন।

একটু পরেই একজন ভৃত্য একটি স্ফটিক-ভৃঙ্গারে মৃত সঞ্জীবনী সুধা একটি সোনার ছোট গেলাস আর একটি রৌপ্য ভৃঙ্গারে জল নিয়ে এল।

পৃথ্বীপতি বললেন—"আর একটা পানপাত্র নিয়ে আয়। আমিও খাব—।"

ভৃত্য চলে গেল।

পৃথ্বীপতি রত্নাকরের দিকে চেয়ে আর একবার হাসলেন।

॥ ১৩ ॥

সেদিন শনিবার। অমাবস্যা রাত্রি। শ্মশান-কালীর পূজা করছিল সেদিন ভোগবতা। একাই সব করছিল। এমন কি পাঁঠা বলিদান পর্যন্ত। একটি কালো পাঁঠা স্বহস্তে বলি দিয়ে সে তার চামড়া ছাড়াচ্ছিল একটা আশ্‌স্যাওড়া গাছের ডালে টাঙিয়ে। সামনেই কিছু দূরে স্তূপীকৃত কাঠে দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলছিল। ভোগবতী পাঁঠাটা ছাড়িয়ে গোটাই ঝলসাবে সেটাকে। অদ্ধি ছু'-ক্রোশ দূরে চন্দন-মোহানী শ্মশানে শবাসনে বসে' তপস্যা করছে। সেখানকার ধূর্জটি মন্দির থেকে নাকি মহেশ্বর অন্তর্দ্ধান করেছেন। অদ্ধি গেছে কারণ নির্ণয় করতে। কখন ফিরবে ঠিক নেই। এসেই খেতে চাইবে। তার জন্যে এক কলসী তাল-রস এনে রেখেছে এবং এখন ঝলসানো মাংস প্রস্তুত করে' রাখছে। একাই সব করছে। কারণ শ্মশান-কালীর মন্দিরে বসে' সে একাগ্রচিত্তে মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করছিল—"হে দেবাদিদেব মহাকাল, আমাকে মহা-অন্ধকারে যাবার শক্তি দাও। আলো আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমাকে অপমান করেছে। আমি তার প্রতিশোধ নিতে চাই। তুমি আমাকে শক্তি দাও।"

ভোগবতীর আশা ছিল, দেবতা আত্মপ্রকাশ করে' তাকে বর দেবেন। তাই সে কাউকে সঙ্গে করে' আনে নি। একাই সব করছিল। পাঁঠার নাড়ী-ভুঁড়িগুলো বার করে' সে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারের ভিতর। একদল শৃগাল এসে সেগুলো কাড়াকাড়ি করে' খেতে লাগল অন্ধকারের ভিতর। একটা অদ্ভুত উপমা জাগল ভোগবতীর মনে। মনে হল—রত্নাকর যেন ওই নাড়িভুঁড়িগুলো—আর তারা যেন সব ওই হ্যাংলা শেয়ালের দল। তাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। তাপ্তি তো কামড়ে ধরে আছে' কিছুতে ছাড়বে না।

"দূর হ—দূর হ—দূর হ সব—"

একটা জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে দিলে সে অন্ধকারের দিকে। পালিয়ে গেল শেয়ালগুলো। একটু দূরে অন্ধকারের ভিতর আবার শোনা যেতে লাগল তাদের কোলাহল। তারপর ভোগবতী পাঁঠার রাং চারটে আলাদা করে ফেললে—শেষে মুণ্ডটাকেও ভাল করে পরিস্কার করে দিয়ে এল মা-কালীর মূর্তির সামনে। তারপর সে মা কালীর সামনে মাথা কুটতে কুটতে নিজস্ব মন্ত্রটি বার বার বলতে লাগল—

ওগো উলঙ্গিনী শিব-শক্তি
শিবকে তুমি হুকুম দাও
নইলে আমার মাথা খাও
মাথা খাও—মাথা খাও।

হঠাৎ আবার শেয়ালদের খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শিয়ালগুলো আবার ফিরে এসেছে। একটা রাং ধরে টানাটানি করছে একটা শিয়াল। সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করে গেল ভোগবতী। তারপর রাং চারটে আর বুক পিঠের মাংস নিবন্ত আংরার উপর লোহার একটা প্রকাণ্ড ঝাঁঝরি বসিয়ে তার উপর রাখলে সে। পাশেই একটা বাটিতে ঘি ছিল। পলা দিয়ে তুলে সেই ঘি একটু একটু ছিটিয়ে দিতে লাগল সে মাংসের উপর। মাঝে মাঝে উলটেও দিতে লাগল মাংসের টুকরোগুলো। এই রকম ভাজা-মাংস অঙ্কির খুব প্রিয় খাদ্য। এটি তৈরী করতে অনেকক্ষণ সময় লাগে। ফোঁটা-ফোঁটা ঘি দিয়ে অনেকবার ওলটাতে পালটাতে হয়। পুড়ে গেলে অঙ্কি খাবে না, ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কাঁচা থাকলেও মুশকিল। মার-পিট করবে। যদিও অঙ্কির হাতে মার খেতে তার খুব ভালোই লাগে। তবু আজ তাকে রাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না ভোগবতীর। কাল থেকে নিরম্বু উপবাস করে শব সাধনা করছে বেচারি। আজ তার খাবারটা ভালো করে' করতে হবে। নিবিষ্ট চিত্তে মাংসটা ভাজ ছিল সে। হঠাৎ চারদিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ভোগবতী চোখ তুলে দেখল—

দিব্যকান্তি দু'টি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। দুজনেরই মাথায় মণি-মাণিক্য খচিত মুকুট।

একজন বললেন—"আমি ইন্দ্র।"

আর একজন বললেন—"আমিই বরুণ।"

ভোগবতী বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠে গিয়ে প্রণাম করল তাদের।

"এখানে এই শ্মশানে কি দিয়ে আপনাদের সম্বর্দ্ধনা করি—।"

ইন্দ্র বললেন—"এক টুকরো করে মাংস দাও। বেড়ে গন্ধ ছেড়েছে। কি হে বরুণ, তোমার আপত্তি নেই তো?"

"না বিন্দুমাত্র না। সমুদ্রের তলায় থাকি সেখানে মাছ ছাড়া আর তো কিছু পাওয়া যায় না।"

ভোগবতী বলল—"এটা আমার স্বামীর জন্য রেঁধেছি, তাঁকে আগে না দিয়ে তো আর কাউকে দিতে পারব না মহাদেবকে দুটো বেল দিয়েছি আজ। সেই দুটো আপনারা নিয়ে যান।"

ভোগবতী ছুটে গিয়ে মন্দির থেকে বড় বড় দুটো বেল নিয়ে এল।

"এই বেলে বিচি নেই, আঠা নেই—।"

ইন্দ্র বললেন—"খুশী হলাম।"

বরুণ বললেন—"আমিও।"

তারপর দুজনেই সমস্বরে বললেন—"কিন্তু সব চেয়ে খুশী হলাম তোমার স্বামী ভক্তি দেখে।"

ভোগবতী ঠোঁট উলটে বলল—"স্বামীকে আমি ভক্তি করি না। ভোগ করি।"

ইন্দ্র বললেন—"আরও খুশী হলাম তোমার সরলতার জন্য।"

ভোগবতী প্রশ্ন করল—"আসল কথাই তো জিজ্ঞেস করিনি এখনও। আপনারা আমার কাছে এসেছেন কেন?"

"দেবাদিদেব আমাদের পাঠিয়েছেন তোমাকে বর দিতে—।"

ভোগবতী বলল—"মা তাহলে আমার প্রার্থনা শুনেছেন। পবনদেব

আমাকে বায়ুর উপর আধিপত্য দিয়েছেন—আমি হাওয়া থামিয়ে দিতে পারি, আমি ঝড় তুলতে পারি। আপনি মেঘবাহন ইন্দ্র, আপনি আমাকে মেঘের উপর আধিপত্য দিন। আমি যখন যেখানে চাইব মেঘেরা যেন সেখানে আসে বজ্র-বিদ্যুৎ নিয়ে। আর আপনি বরুণদেব —আপনি সমুদ্রের অধীশ্বর। আপনি আমাকে সমুদ্রের উপর আধিপত্য দিন। যেন আমি যখন খুশী সমুদ্রে তুফান তুলতে পারি। যখন খুশী সমুদ্রকে শান্ত করতে পারি—"

উভয়েই বললেন—তথাস্তু।

ইন্দ্র তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন—"জানতে ইচ্ছে করছে আপনি এসব ক্ষমতা চাইছেন কেন?"

"সংক্ষেপে বললে বলতে হয় শত্রুদমন করবার জন্য।"

"ও।"

বরুণ বললেন—"আপনার একটি কথা শুনে আমার কৌতূহল হচ্ছে। মনে হচ্ছে আপনি রাগী মানুষ তাই জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছে না।"

ভোগবতী হেসে বলল—"ঠিক বলেছেন। সত্যি আমি খুব রাগী। তা আপনি কি জানতে চান বলুন। রাগ করব না।"

"আপনি এখনি বললেন স্বামীকে আপনি ভক্তি করেন না, ভোগ করেন। আপনার ভক্তিভাজন কেউ নেই?"

"আছে বই কি। উলঙ্গিনী কালী আর উলঙ্গ শঙ্কর।"

"এদের ভক্তি করেন কেন?"

"কারণ এরা নগ্ন। এদের কোন কৃত্রিম আবরণ নেই। কোনও ভণ্ডামি নেই। তাই এদের আমি ভক্তি করি।"

"এদের কাছে আপনার প্রার্থনা কি?"

"আমাকে অন্ধকারে নিয়ে চল।"

ইন্দ্র এবং বরুণ দুজনেই নমস্কার করলেন ভোগবতীকে। তারপর অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

চতুর্দিকে আবার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

একটু পরেই অন্ধকার অট্টহাস্যে কাঁপতে লাগল। অদ্ধি আসছে।

অদ্ধি এসেই ভোগবতীকে স্কন্ধে তুলে নৃত্য করতে লাগল।

"ছাড় আমার উরুতে লাগছে—"

"লাগুক।"

"মাংসটা পুড়ে যাবে। ওটা নাবিয়ে নি—।"

কাঁধের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল ভোগবতী। মাংসটা নাবিয়ে নিল আগুনের উপর থেকে।

"ধুর্জ্জটি মন্দিরের মহাদেবের খবর পেলে?"

"তিনি গেছেন অনন্তনাগের সঙ্গে দেখা করতে।"

"কেন?"

"তা বোঝা গেল না। দাও খাই কিছু।"

একটা রাং তুলে নিয়ে সে কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। কস বেয়ে রক্ত পড়তে লাগল তার। মাংসটা কম ভাজা হয়েছিল। ভোগবতী বললে—"কারণ কিন্তু পাই নি। তালরস এনে রেখেছি—।"

অদ্ধি কলসীটা তুলে চোঁ চোঁ করে' খেয়ে ফেললে খানিকটা।

কাণ্ড দেখে খিল খিল করে হাসতে লাগল ভোগবতী।

## ॥ ১৪ ॥

দেখতে দেখতে সুসংবাদটি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। রত্নাকর সুস্থ হয়েছে। এইবার সে সমুদ্র-যাত্রায় বের হবে। সাজ সাজ পড়ে গেছে চারি দিকে। বিরাট ময়ূরপংখী সাজানো হচ্ছে, তাছাড়া সঙ্গে যাচ্ছে পাঁচশো নৌকার নৌবহর। পরিচয় পাহাড়ী প্রায় হাজার খানেক দক্ষ নাবিক সংগ্রহ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। মহারাজা পৃথ্বীপতি দুই শত বড় বড় বজরা দিয়েছেন, তাতে সশস্ত্র সৈন্য থাকবে। পরিচয় পাহাড়ীও অনেক সৈন্য সঙ্গে নিচ্ছে। সমুদ্র যাত্রায় জল-দস্যুর খুব ভয়।

বাড়িতে ক্রমাগত লোক আসছে। কেউ সঙ্গে যেতে চায়, কেউ কোনও জিনিস বিদেশ থেকে আনবার জন্য অনুরোধ করে। দশ বারোজন মুহুরী খাতা নিয়ে বসে আছে তাদের ফরমাস টোকবার জন্য।

রত্নাকর কাউকে 'না' বলতে পারে না। যারাই তার সঙ্গে যেতে চায় রত্নাকর আপত্তি করে না। বহু পুরুষ তো যাচ্ছেই অনেক মেয়েও যেতে চায়। রত্নাকর বলে, বেশ তো, বেশ তো যাবে।

একদিন ফল্গু এসে হাজির হল। পরনে আগুন-রঙের কাপড়। খোঁপায় অশোক ফুলের গুচ্ছ। হাতে চুড়ি নেই, চুড়ির বদলে লাল কুন্দ-ফুলের মালা জড়ানো, গলায় রক্ত করবীর মালা। এসে সটান বাড়ির ভিতর চলে গেল সে। রত্নাকর বিছানায় বসেছিল, তার পাশে গিয়ে বসল।

"কাকু, তুমি শুনলাম সমুদ্র যাত্রায় বের হচ্ছ ?"

"হ্যাঁ, তুমি যাচ্ছ নাকি ?"

"না, আমি যাব না। তুমি যখন থাকবে না, তখন একা একা

আমি তোমার বাগানে ঘুরে বেড়াব, তোমার শোবার ঘরে ঢুকব। তোমার বসবার ঘরে বসব। তোমাকে আমি ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেলি। তুমি যখন কাছে থাকবে না, তখনই তোমাকে সব চেয়ে কাছে পাই আমি। আমি যাব না তোমার সঙ্গে। তুমি যখন থাকবে না, তোমার চাকররা যেন তোমার বাগানে ঘরে ঢুকতে দেয় আমাকে। আর আমাকে যখন তুমি মনে করবে—এই পোষাকে মনে কোরো। যে আগুন আমার মনে জ্বলছে, যা আমি জীবনে কখনও প্রকাশ করতে পারব না, তারই কিছুটা আভাস আমার এই পোষাকে আছে। কাকীমা কোথায়?"

"সে পূজোর ঘরে আছে।"

"বাইরে আমার চাকর একঝুড়ি আঙুর এনেছে, খেও। নতুন ধরনের আঙুর। গোলাপী রঙের। আমি আর বেশীক্ষণ বসব না। চললুম—।"

প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ফল্গু।

একটু পরে তাপ্তি এসে ঘরে ঢুকল।

"ফল্গু এসেছিল বুঝি।"

"হ্যাঁ।"

"নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে যেতে চাইছে।"

"না। সে যাবে না। বললে, আমরা যখন থাকব না সে একলা আমাদের বাড়িতে বাগানে ঘুরে বেড়াবে।"

"মেয়েটা পাগল। আজ আবার কি ফল এনেছে। খেও না যেন—।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি চাকর একটি লাল রেশমের থলিতে আঙুর নিয়ে এল।

"কি আছে ওতে?"

চাকর একটি রূপোর থালায় আঙুরগুলি ঢালতেই চমকে উঠল দুজনেই। আঙুরের ভিতর থেকে গোলাপী মেঘের আভা ফুটে বেরুচ্ছে যেন।

"কি ফল এগুলো" ভ্রূকুঞ্চিত হল তাপ্তির। রত্নাকর বললে—"আঙুর। এ খেলে কিছু হবে না।" বলেই সে কয়েকটা আঙুর মুখে ফেলে দিলে।

"অপূর্ব। খেয়ে দেখ তুমি—"

"আমি খাব না। তুমি যত খুশী খাও।"

রেগে বেরিয়ে গেল তাপ্তি।

রত্নাকর একটু মুচকি হেসে আরও দু-চারটি আঙুর তুলে নিল।

তাপ্তি ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেল পদ্মা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহ হল বোধহয় আড়ি পাতছিল।

"তুই এখানে কি করছিলি ?"

"পরিচয় পাহাড়ী এসেছেন। তিনি জানতে চাইছেন ময়ূর-পংখীতে মেয়েদের জন্য কটা ঘর রাখতে হবে ? আমি বললুম আমি মায়ের সঙ্গে থাকব। আর কে যাবে আমি জানি না।"

"আমি যতদূর জানি আমি ছাড়া আর কেউ যাবে না।"

পদ্মা ঠোঁট টিপে একটু হেসে বলল—"আমি না গেলে পান সাজবে কে ? আমার হাতের পান ছাড়া আর কারো হাতের পান বাবুর পছন্দ হয় কি ? তোমার মত অবশ্য আমি সাজতে পারি না, কিন্তু তুমি কি ওখানে গিয়ে পান সাজবে খালি ? কর্তার যে মুহুর্মুহু পান চাই—"

"তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

"পরিচয় পাহাড়ীকে কি বলব ?"

"তুই পরিচয়কে বাবুর কাছে ডেকে দে। আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

তাপ্তি ভিতরে চলে গেল। পদ্মা বাইরে গিয়ে পাহাড়ীকে বলল—"পরিচয়দা তুমি ভিতরে গিয়ে কর্তা মহাশয়ের সঙ্গে কথা বল।" তারপর একটু নীচু গলায় বললে—"আমার জন্যে একটু জায়গা রেখো। পরিচয়দা, লক্ষ্মীটি—"

পদ্মার সম্বন্ধে পরিচয়ের দুর্বলতা ছিল। হেসে বলল—"নিশ্চয় নিশ্চয়, অন্য ঘর না পাই আমার ঘর তো আছেই—"

"দুষ্টু কোথাকার—।"

একটি কোপ কটাক্ষ হেনে পদ্মা বলল, "চল, এখন কর্তা মশায়ের কাছে চল।"

কয়েকটি আঙুর খেয়ে খোশ মেজাজে বসেছিল রত্নাকর।

"কি খবর তোমার পরিচয় ?"

"আমি জানতে এসেছি ময়ুরপংখীতে মেয়েদের জন্যে কটা ঘর প্রস্তুত রাখব ?"

"বড় ময়ুরপংখীতে কটা ঘর আছে ?"

"পঁচিশ-টা।"

"পঁচিশটাই প্রস্তুত করে রাখ। কে কে যেতে চাইবে জানি না তো। কাউকে তো না বলতে পারব না।"

"যে আজ্ঞে।"

খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল নর্মদা। রত্নাকর সমুদ্র-যাত্রায় বেরুবে ? সঙ্গে ময়ূরপংখী আর অনেক নৌকো ? মনটা নেচে উঠল তার। রোজ সেই খাওয়া শোয়া আর কবিরাজী ওষুধ তৈরি ভালো লাগে না আর। রোজ ওষুধ কোটা, ওষুধ বাছা, ওষুধ বাটা, ওষুধ পাক দেওয়া। কোনটা তিন পাক, কোনটা সাত পাক। আর কি বিশ্রী গন্ধ, কি ঝাঁজ। স্বামী দিনরাত লেখা পড়া নিয়ে ব্যস্ত। রোগী এলে দেখতে চায় না।

খবরটা শুনে সে জলধির ঘরে উঁকি মেরে দেখল। তন্ময় হয়ে পড়ছে সে।

"ওগো, শুনছ ?"

জলধি তন্ময় হয়ে পড়ে চলেছে। শুনতে পেল না।

"ওগো শুনছ ?"

ঘাড় ফেরাল জলধি।

"রত্নাকর সমুদ্র যাত্রায় বেরুচ্ছে। তোমার তো অনেক ওষুধ ফুরিয়েছে। ভালো গোল মরিচ, লবঙ্গ, চন্দন, শুশুকের তেল, গণ্ডারের খড়গ—সব তো বাড়ন্ত।"

"তাই নাকি। তাহলে তো রত্নাকরের সঙ্গে যেতে হয়। ওসব জিনিস তো এদেশে মেলে না—"

"চল তাহলে রত্নাকরকে বলি গিয়ে। আমিও যাব।"

"তুমি ? তুমি গিয়ে কি করবে ? ঘর বাড়ি কে দেখবে ?"

"আমার কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই ?"

"বাড়িতেই সাধ-আহ্লাদ কর না। তোমাদের সাধ-আহ্লাদ তো পরচর্চা আর ঘোঁট। পাড়ার মেয়েদের ডেকে এনে যত ইচ্ছে ঘোঁট করতে পার। আমি তো থাকব না। আর আমার গাছ-গাছড়ার বাগান দেখবে কে ?"

"মালীরা দেখবে। আমি যাবই। আমি সমুদ্র কখনও দেখিনি।"

"সমুদ্র দেখে কি দশটা হাত গজাবে ?"

নর্মদা আবদারের সুরে বলল—"না, আমি যাব—।"

"আমাকে কি রত্নাকরের মতো স্ত্রৈন পেয়েছ, যে স্ত্রীর কথায় ওঠা-বসা করব ?"

এরপর নর্মদা সটান শুয়ে পড়ল জলধির পায়ের উপর।

"দোহাই তোমার। আমাকে বাধা দিও না। আমি যাবই। যদি না যেতে দাও, আত্মহত্যা করব।"

জলধি খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে চেয়ে রইল তার দিকে। তারপর বলল—"এ তো এক মহাসমস্যায় ফেললে তুমি। আমারই যাবার ঠাঁই হবে কি না ঠিক নেই। আমি আবার শঙ্করাকে নিয়ে যাব কোন আক্কেলে—।"

"আমি জানি রত্নাকর আমার অনুরোধ উপেক্ষা করবে না। সে আমাকে ভালোবাসে—।"

নর্মদার মনে পাপ থাকলে সে এ কথা বলতে পারত না। জলধি একথা শুনে বিচলিত হল না। তার স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে তার কোনও সন্দেহ নেই। অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—"পা ছাড়, পা ছাড়। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লে কেন? যাবে তো ওঠ। কি বিপদ—।" নর্মদা উঠে বসল।

অর্ণব দিনরাত তপস্যা নিয়েই থাকত। হিরন্ময়ী নদীর মধ্যে ছোট একটি দ্বীপের মতো ছিল—সেইখানেই অধিকাংশ সময় কাটত তার। সেইখানেই সে তার ভগবানকে নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকত। সমাজের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না তার। একটি ছোট নৌকো ছিল ত্রিবেণী সঙ্গমে। সেই নৌকো করে গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী মন্দাকিনী প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে একবার যেত তার কাছে খাবার নিয়ে। খাবারটা রেখেই চলে আসত তারা। অর্ণবের তাই নির্দেশ ছিল। সেদিন গঙ্গা কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমাকে কিছু বলবে?"

"রত্নাকর সমুদ্রযাত্রা করছেন। প্রকাণ্ড নৌবহর সজ্জিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর ময়ূরপংখীও সঙ্গে যাচ্ছে। তিনি কুমারীকা অন্তরীপ ঘুরে আরও দূর দেশে যাবেন। আমাদের চার জনেরই কন্যাকুমারী দর্শন করবার খুব ইচ্ছে—"

অর্ণব একটু হেসে বলল—"এ ইচ্ছে হল কেন?"

উত্তর দিল সরস্বতী—"হবে না? নারী জীবনের পরম গৌরব ও চরম হতাশা যার মধ্যে মূর্ত হয়েছে, যিনি মহাদেবকে স্বামী রূপে পেয়েছিলেন, কিন্তু দেবতাদের ষড়যন্ত্রে তাঁর গলায় মালা দিতে পারেন নি, কিন্তু তবু যিনি ভেঙে পড়েন নি, আজও মালা হাতে

করে হিমালয়ের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দেখব না ? তার মধ্যে যে নারীত্বের গৌরব, দুঃখ এবং বিশ্বাস মূর্ত হয়েছে—তাঁকে দেখবার ইচ্ছে হবে না ?"

অর্ণব বলে উঠলেন—"বাঃ, চল এখুনি রত্নাকরের কাছে যাই। আমাকেও একবার লঙ্কায় যেতে হবে।"

"লঙ্কা ? কেন ?"

"আমি আজকাল রাবণ জননী নিকষার হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। তিনি এখনও লঙ্কার শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর বলছেন—রাবণের মৃত্যুর কারণ রাম নন, মৃত্যুর কারণ তার প্রবল প্রতাপ ও প্রচুর ঐশ্বর্য। তিনি আমাকে বলেছেন আমি এখনও প্রেতিনী হয়ে এখানে আছি। তুমি এসে আমাকে প্রেতলোক থেকে উদ্ধার কর। আর আমার এই বিশ্বাস প্রচার কর যে রাবণের মৃত্যুর কারণ তার প্রতাপ, তার অহঙ্কার, তার ঐশ্বর্য। রোজই এই স্বপ্ন দেখি। তাই ভাবছি লঙ্কায় যাব একবার। রত্নাকরের সঙ্গেই যাব।"

মন্দাকিনী কিছু বলল না। তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ বয়ে গেল শুধু।

অর্ণব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

"চল এখনই যাই। শুভস্য শীঘ্রম। রত্নাকর আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তোমাদের সকলকে নিয়ে যাবার মত স্থান তার ময়ূরপংখীতে বা অন্য কোনও নৌকায় হবে কিনা জানি না। তবে তোমরা যেতে চাইলে সে একটা ব্যবস্থা করবেই। চল, বেরিয়ে পড়া যাক—"

রত্নাকরের বাড়ি পৌঁছে দেখে হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড। অম্বুধিকে কাঁধে নিয়ে সাগর দাঁড়িয়ে আছে। সাগরের স্ত্রী বিতস্তা মূর্ছিতা। সে রত্নাকরের জন্য ক্ষীর-শসা এনেছিল—তা চারদিকে ছড়ানো পড়ে আছে। সাগরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী এবং তার বিধবা বোন কাবেরী। রত্নাকর বারান্দায় হাতজোড়

করে দাঁড়িয়ে আছে অপ্রস্তুত মুখে। ইরাবতীর উন্মুখ উৎসুক দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ। তার সমস্ত কামনা যেন বিদ্যুৎরেখার মত স্পর্শ করছে রত্নাকরের সর্বাঙ্গ। কাবেরীরও আলুলায়িত বেশ। তার পীন পয়োধরের খানিকটা অনাবৃত। চোখের কটাক্ষে লালসা, মুখের মৃদু হাসিতে সাগ্রহ নিমন্ত্রণ। সে যেন মূর্তিমতী রতি। রত্নাকর করজোড়ে বলল—"আমার স্ত্রীর অসৌজন্যের জন্য আমি লজ্জিত। আমি বিতস্তা দেবীর কাছে ক্ষমা চাইছি। তিনি যে খাবার এনেছেন তা আমি খাব। আর এ প্রতিশ্রুতিও আমি দিচ্ছি আমার সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় যাঁরা যেতে চান, সকলকেই আমি নিয়ে যাব। আমার ময়ূরপংখীতে ও নৌবহরে স্থানাভাব ঘটবে না।"

হঠাৎ তাপ্তি বেরিয়ে এল গলবস্ত্রে। বলল—"এস, এস, সবাই এস। আমাকে ক্ষমা কর। আমি নাকখৎ দিচ্ছি। আমার ঘাট হয়েছে—"

এই বলে সত্যিই সে নাকখৎ দিতে উদ্যত হল। রত্নাকর তাকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল আস্তে আস্তে। মন্দাকিনী মৃদুকণ্ঠে অর্ণবকে বলল—"আমরা রত্নাকরের সঙ্গে যাব না। মনে হচ্ছে আমরা সঙ্গে গেলে তাপ্তি অসন্তুষ্ট হবেন।"

অর্ণব বলল—"আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমরা বাড়ি ফিরে যাই চল। তবে রত্নাকরকে সেটা বলে যাই—।"

রত্নাকর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িব ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এসেই সে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল অর্ণবকে। তারপর বলল—"চলুন, ভেতরে চলুন—"

"না, এখন আর যাব না। তুমি সমুদ্র যাত্রা করছ শুনে তোমার কাছে এসে ছিলাম। আমার লঙ্কায় যেতে হবে একবার। এরাও কন্যাকুমারীকা দেখতে চায়। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু তোমার এখানে এসে যা দেখলাম—তাতে মনে হয় তোমার সঙ্গে যাওয়াটা সঙ্গত হবে না। তাপ্তি দেবী বোধহয় বেশী ভীড় পছন্দ

করছেন না। আমি একটা আলাদা নৌকোর ব্যবস্থা করি। তোমাদের পিছু-পিছুই যাব।"

রত্নাকর বলল—"এ অঞ্চলের সব নৌকো পাহাড়ী ভাড়া করেছে। আপনি নৌকো পাবেন না।"

"এত নৌকো নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"দেশটার নাম নাকি উপরিকা। প্রকাণ্ড অরণ্য সমাকুল মহাদেশ সেটা। সেখানে গজদন্ত আর গজ-অস্থি না কি খুব সস্তায় পাওয়া যায়। আমি পাঁচশো নৌকো নিয়ে যাচ্ছি সেখানে। পথেও যে সব নৌকো পাব ভাড়া করব—।"

"এত গজদন্ত আর গজ-অস্থি তুমি পাবে কোথায় ?"

"যিনি এ খবর নিয়েএসেছেন তিনি বলেছেন যে সে দেশে হাতীরা মৃত্যুর আগে গভীর বনের মধ্যে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে অন্নজল ত্যাগ করে' বসে' থাকে। বার্দ্ধক্যে তারা স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে। এই রকম কয়েকটি হাতীর শ্মশান আবিস্কার করেছেন তিনি। সেখানে প্রচুর গজদন্ত ও গজ-অস্থি ছড়ানো আছে। আমি তার সাহায্যে সেগুলো সংগ্রহ করব বলে' যাচ্ছি।"

অর্ণব বললেন—"তাহলে তুমি ঘুরে এস। আমি পরে যাব।"

"আপনি আমার একটা নৌকো নিয়ে যান না—।"

"যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু নৌকোর ভাড়াটা তোমায় নিতে হবে। না নিলে মন্দাকিনীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে। সে তাপ্তি দেবীর অস্বস্তির কারণ হতে চায় না।"

রত্নাকর চুপ করে' রইল ক্ষণকাল। তারপর বলল—"বেশ তাই হবে। আপনার আদেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই। যা বলবেন তাই হবে। আপনাকে কিন্তু আমার সঙ্গেই যেতে হবে। আপনাকে সঙ্গীরূপে পেলে আমি ধন্য হব।"

অর্ণব মন্দাকিনীর দিকে ফিরে বলল—"এতে তোমার মত আছে তো ?"

মন্দাকিনী আশা আকাঙ্ক্ষায় কাঁপছিল। মাথা নেড়ে জানাল—মত আছে।

কবি পারাবার তাঁর ধানের ক্ষেতে মাচার উপর বসেছিল। চারদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজের সমুদ্র। সে কিন্তু বসেছিল স্বপ্নের সমুদ্রের মধ্যে। অধিকাংশ সময়ই সে তার এই ছোট মাচাটির উপর বসে থাকে। মাচার পাশেই ছোট্ট একটি মাটির ঘর আছে। তাতে আছে লেখবার সরঞ্জাম। পারাবার মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে সেখানে কবিতা লেখে। পারাবার একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। তার সংসার চলে তার চাষের আয় থেকে। বেশ ধনী লোক সে। বিদেশের হাটে সে ফসল পাঠায় রত্নাকরের নৌকোয়। এসব ব্যবস্থা করবার জন্য তার বিশ্বাসী চাকর আছে অনেক। তারাই সব করে। পারাবার কবিতা লেখে শুধু, আর নির্জন মাঠের মধ্যে তন্ময় হয়ে বসে' থাকে। তার আর একটি কাজ আছে। সে অন্য পণ্ডিত বা কবির লেখা সুন্দর করে' লিখে দেয় তাল পাতায়। মুক্তোর মত হাতের লেখা তার। এর জন্যে সে পারিশ্রমিক নেয়। কিন্তু পারিশ্রমিক দিলেই সে লেখে না। যে লেখা পড়ে' তার ভালো লাগে তাই সে সুন্দর করে' লিখে দেয়। ব্রাহ্মণী তার জন্যে রোজ দুপুরে খাবার নিয়ে আসে। সেদিন পারাবার লক্ষ্য করল ব্রাহ্মণী বেশ দ্রুত বেগে আসছে। তার পিঠের বেণী আর বাঁ হাতটা যেন বেশী জোরে দুলছে। ব্রাহ্মণী অপরূপ সুন্দরী। যেন একটি অর্দ্ধ-বিকশিত শ্বেত-পদ্ম। শুধু সৌন্দর্য নয়, পবিত্রতাও বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন। সে অর্ণবের শিষ্যা, পারাবারের পত্নী। তার নিষ্ঠায় কোনও খুঁত নেই, তার স্বামী-ভক্তিও নিখুঁত, কিন্তু রত্নাকরকে সে ভালোবাসে। সে ভালোবাসার কথা পারাবারকেও বলেছিল একদিন। তা শুনে পারাবার রাগ করেনি, খুশী হয়েছিল। বলেছিল—"তাহলে তো তুমি একজন বড় শিল্পী

দেখছি। শিল্পীরাই সৌন্দর্যকে ভালবাসে। রত্নাকর সুন্দর, রূপে সুন্দর, গুণে সুন্দর, তাকে তো ভালোবাসাই উচিত। তোমার শিল্প-বোধের পরিচয় পেয়ে খুশী হলাম।”

ব্রাহ্মণী মুচকি হেসে বলেছিল—“সত্যি কথা বলছ, না কবিত্ব করছ?”

“সত্যি কথা বলছি কিনা জানি না। কারণ সত্য কি তাই জানি না। পৃথিবীর সব জিনিষই বদলায়। সত্যও বদলায়। সাদা স্তূপ মেঘটা কুমীরের মত ছিল একটু আগে, এখন অপ্সরীর মত দেখাচ্ছে। দুটোই সত্য, দুটোই সুন্দর। ওই প্রজাপতিটা দেখ, কি চমৎকার। একটু আগে ওটা গুটিপোকা ছিল। দুটোই চমৎকার। আমি সুন্দরের উপাসক, তাই রত্নাকরকে ভালোবাসি, তুমিও রত্নাকরকে ভালবাস জেনে খুশী হয়েছি। রাগ করব কেন? এ-ও আমি জানি এই ভালবাসা কালক্রমে হয়তো প্রণয়ে রূপান্তরিত হতে পারে। যদি হয় হোক না—যদি সত্যি সেটা সুন্দর হয়। আমি তোমার প্রণয়ী তাই জানি, প্রণয় বড় সুন্দর। তুমি যদি ভালবেসে ফেল, সে তো ভারি মজা হবে। আমার হিংসা হবে না। কারণ তোমার সুখেই আমার সুখ। আমার হিংসে হবে না, যে সাদা মেঘকে আমি ভালবাসি সে যখন চাঁদকে জড়িয়ে ধরে আমার খুব ভাল লাগে, একটুও রাগ হয় না। বরং মনে হয়, আহা, আমিও যদি ওদের জড়িয়ে ধরতে পারতাম। কিন্তু পারি না। আমার এই না পারাটা স্বপ্ন হয়ে যায়। কবিতা লিখি।—”

এইসব কথা বহুদিন আগে পারাবার বলেছিল ব্রাহ্মণীকে। ব্রাহ্মণী মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিল—“আমি রত্নাকরকে ভালোবাসি, তুমি আমাদের নিয়ে একটা মহাকাব্য লিখে ফেল।”

“প্রণয় এখনও জমে নি। জমলেই লিখে ফেলব। তবে তোমাকে বাহাদুরি দিই, তোমার মাত্র দুটো পা, কিন্তু তিন নৌকোয় পা রেখে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছ। অথচ তোমার গায়ে কাদা লাগে নি।”

"তিন নৌকো মানে?"

"এক নৌকো আমি। আর এক নৌকো অর্ণব, তৃতীয় নৌকো রত্নাকর—। অথচ তোমার চরিত্র স্ফটিক-শুভ্র আছে। তোমার ব্রাহ্মণী নাম সার্থক।"

পারাবার নির্নিমেষে চেয়ে রইল ব্রাহ্মণীর দিকে। এত হনহন করে আসছে কেন?

ব্রাহ্মণী হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হল শেষে।

"খবর শুনেছ?"

"কি?"

"রত্নাকর সমুদ্র-যাত্রা করছে ময়ূরপংখী নিয়ে। সঙ্গে অনেক নৌকো আছে। এ অঞ্চলের সব নৌকো ভাড়া করেছে সে। সাগর, অম্বুধি, মন্দাকিনী, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সবাই গিয়েছিল রত্নাকরের কাছে। রত্নাকর বলেছে সবাইকে নিয়ে যাবে। চল, আমরাও যাই। গুরুদেবও সঙ্গে যাবেন।"

"আমি স্বপ্নের সমুদ্রে সর্বদা ডুবে থাকি, কিন্তু আসল সমুদ্র কখনও দেখি নি। রত্নাকর কি আমাদের নিয়ে যাবে?"

"তুমি বললে নিশ্চয় যাবে। সে খুব খাতির করে তোমাকে। খেয়ে নাও, তারপর চল যাই তার কাছে—"

"তুমি যাও না। আমার হাঁটাহাঁটি করলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। অতদূর গিয়ে হয়তো কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলব। হয়তো বলে বসব—

হে রত্নাকর কোর না ভাবনা
তোমার সঙ্গে যাব না যাব না
এতদূর হেঁটে এসেছি কেবল
নেহারিতে তব বদন কমল।
একটু হাসিয়া চাহ একবার
এর বেশী কিছু চাহিনাক আর।

তুমি যাও, তুমি গেলেই কাজ হবে।

"আমি তার সামনে একটি কথাও বলতে পারব না।"

"তাহলে ব্যাপার বেশ ঘনীভূত হয়েছে বল?"

ব্রাহ্মণী ধমকের সুরে বলল—"বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—।"

পারাবার এবার হেসে ফেললে। এবারও কিন্তু কবিতায় উত্তর দিল—

"লো রূপসী ব্রাহ্মণী
কঙ্কন কন-কনি
কণ্ঠে তুলি কোমল নিখাদ
আদেশ করিলে যাহা
অবশ্য পালিব তাহা
নিশ্চয় পুরাব তব সাধ।"

পারাবার খেতে বসল।

ব্রাহ্মণী তার সামনে বসে ছোট একটা হাত-পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল তাকে। সে সঙ্গে একটা ছোট পাখাও এনেছিল। রোজ আনে।

অদ্ধি আর ভোগবতীও গিয়েছিল রত্নাকরের কাছে। রত্নাকর বলেছে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। অদ্ধি ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছিল। ভোগবতীর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। সে জানলার ধারে অন্ধকারের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। অন্ধকারের ভিতরই সে যেন দেখতে চাইছিল তার ভবিষ্যতকে। সেদিন কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল না। কৃষ্ণা-অষ্টমীর চাঁদ উঠেছিল। দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' দাঁড়িয়েছিল সে নিস্তব্ধ হয়ে। রত্নাকরের মুখটা মনে পড়ছিল মাঝে মাঝে। পরিচয় পাহাড়ীকে সে বলে এসেছে রত্নাকরের পাশের

ঘরটাই যেন তাকে দেওয়া হয়। পাহাড়ী লোভী পশু একটা। সে যে তাকে অনুরোধ করেছে, এতেই কৃতার্থ হয়ে গেছে সে। বার বার বলেছে নিশ্চয়ই রত্নাকরের পাশের ঘরটাই সে রাখবে তাদের জন্য। রত্নাকর আদেশ দিয়েছে যে পুরুষরা সব আলাদা আলাদা নৌকায় থাকবে আর মেয়েরা থাকবে তার ময়ূরপংখীতে। এ সংবাদ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে ভোগবতী।

হঠাৎ চমকে উঠল সে। বিরাট একটা পাহাড়ের মত কি যেন এগিয়ে আসছে তাদের বাড়ির দিকে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওঠালে অব্ধিকে।

"ওঠ, ওঠ, একটা পাহাড় চলে আসছে আমাদের বাড়ির দিকে—।"

অব্ধি ধড়মড় করে' উঠে দাঁড়াল গিয়ে জানলার ধারে। দাঁড়িয়েই নমস্কার করতে করতে বলল—"উনি মহেশ্বরের নন্দী। শাঁখ বাজাও।"

ভোগবতীর মহাশঙ্খ ছিল একটা। সে সেইটে তুলে নিয়ে বাজাতে লাগল। অব্ধি সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল ধ্যানে। পাহাড়টা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর দিক পরিবর্তন করে চলে গেল অন্য দিকে।

সে যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল তখন ভোগবতী বলল—"নন্দী অন্যদিকে চলে গেলেন—।"

অব্ধি তখন ধ্যানে মগ্ন। একেবারে সমাধিস্থ। অব্ধির কোন জবাব না পেয়ে ভোগবতী বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘুরে বেড়াতে লাগল অন্ধকারে। শেষে হাজির হল শ্মশানে এসে। নির্জন শ্মশানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। চাঁদটাও ঢেকে গেল একটা মেঘে। সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল সব। ভোগবতীর সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগল একটা। সে জাপটে ধরতে চেষ্টা করল অন্ধকারকে। কিন্তু অন্ধকারকে বুকে জাপটে ধরা যায় না। জেদ চেপে গেল ভোগবতীর, অন্ধকারকে সে বুকে চেপে ধরবেই। সারা শ্মশানময় সে দুহাত বাড়িয়ে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। আর বার বার বলতে

লাগল—"অন্ধকার, তুমি আমাকে নাও। অদ্ধি আমাকে ভালবাসে না। আমি তার সাধনায় উত্তরসাধিকা মাত্র। আমি তার প্রয়োজনের যন্ত্র। আমি তার প্রেয়সী নই।"

হঠাৎ তার মনে হল মহেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে, মহেশ্বরের কাছে গিয়ে সে নালিশ জানাবে। তাঁকে বলবে—হে উমানাথ, তোমার ভক্ত আমাকে কেন ভালোবাসে না। উন্মাদিনীর মত শ্মশানেশ্বর শিব-মন্দিরের দিকে ছুটতে লাগল সে। গিয়ে কিন্তু দেখল মন্দিরের কপাট খোলা, মন্দিরে মহাদেব নেই।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। তার কেমন যেন একটা আতঙ্ক হল। ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। বাড়ি গিয়ে দেখল—অদ্ধির ধ্যানভঙ্গ হয়েছে। সে গম্ভীর হয়ে বসে আছে।

"শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে মহেশ্বর নেই।"

"তিনি নন্দীর পিঠে চড়ে মহাকুর্মের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন।"

"মহাকুর্ম কে?"

"যিনি পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করে আছেন।"

"তাঁর কাছে গেছেন কেন?"

"সেটা ধ্যানে ধরতে পারলাম না। আন্দাজ করছি নেপথ্যে কিছু একটা ঘটছে। আমি স্বচক্ষে দেব-দৈত্যদের ঢুকতে দেখেছি মহেশ্বরের মন্দিরে। পারাবারও দেখেছে। একটা বিপ্লব বোধহয় আসন্ন।"

"রত্নাকরের সমুদ্রযাত্রার দেরী কত? আমরা তো তার সঙ্গে যাচ্ছি। আমাদের ভয় কি।"

অদ্ধির মুখে হাসি ফুটল। রহস্যময় হাসি। সে কোন জবাব দিল না। কেবল হাসিমুখে চেয়ে রইল সে ভোগবতীর দিকে।

ময়ূরপংখী সাজানো হয়ে গেছে। তার মাথার উপর মহেশ্বরের পতাকা উড়ছে নানা রকম। কোনটা ধ্যানমগ্ন মহাদেব, কোনটা সতীর শব স্কন্ধে মহাদেব, কেউ উমানাথ, কেউ নটরাজ, কেউ মদন ভস্ম করছেন। মহাদেবের পতাকা সব নৌকোতেই উড়ছে। মহেশ্বর অঞ্চলের বহু নরনারী সমুদ্র যাত্রায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। সবাই আনন্দিত। আনন্দ নেই কেবল তাপ্তির মনে। ময়ূরপংখীতে একপাল মেয়ে নিয়ে তার সমুদ্র যাত্রা করবার মোটেই ইচ্ছে নেই। অথচ রত্নাকরকে ছেড়েও সে একদণ্ড কোথাও থাকতে পারে না। সুতরাং তার মনেই কেবল তুষানল জ্বলছে। তার এই অতি ভদ্র, অতি জনপ্রিয়, অতি পরোপকারী, অতি চক্ষুলজ্জা-সম্পন্ন, অত্যন্ত ধনী, অতিশয় রূপবান স্বামীকে নিয়ে সে অতি বিব্রত। সবাই তাকে নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। বেহায়ার দল সব। কদিন থেকে সে রোজই রত্নাকরকে বলছে—"তুমি একাই ঘুরে এস। আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমি ওই ভীড়ের মধ্যে যেতে পারব না। বিয়ের পর থেকে তোমাকে ছেড়ে কোনও দিন থাকি নি। চেষ্টা করে দেখি পারি কি-না।"

রত্নাকর মৃদু হেসে উত্তর দেয়—"দেখই না কি হয় শেষ পর্যন্ত। সবাই হয় তো যাবে না।"

"যাবে না আবার। মেয়েগুলো তো পা বাড়িয়ে বসে আছে।"

"দেখো, শেষ পর্যন্ত কেউ যাবে না।"

"ময়ূরপংখীর পঁচিশটা ঘরে জিনিষ-পত্র এনে রাখতে শুরু করেছে। আমাকে তুমি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

"থাকতে পারবে?"

"হয়তো পারব না। হয়তো মরে যাব। তবু আমি ওই হাটের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতে পারব না। তোমার পেয়ারের লোকদের নিয়ে তুমি বেড়িয়ে এসো।"

রত্নাকর হাসিমুখে চেয়ে রইল। কোনও উত্তর দিল না।

তার পরদিন যা ঘটল তা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত। মহারাজ পৃথ্বীপতি দামামা বাজিয়ে ঘোষণা করলেন—তাঁর রাজ্যের কোন নারী সমুদ্রযাত্রা করতে পারবে না। নিতান্ত প্রয়োজনে যদি কেউ যেতে চান তাঁকে মহারাজের নিকট থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। এ আদেশ অমান্য করলে প্রাণদণ্ড হবে। সেই দিনই একজন বিশেষ রাজদূত একটি সুরঞ্জিত তালপত্রে নিম্নলিখিত পত্রটি দিয়ে গেল রত্নাকরকে। পত্রটি তাপ্তির নামে।

আয়ুষ্মতি রত্নাকর জায়া
শ্রীমতি তাপ্তি দাসী সমীপেষু,
কল্যাণীয়া বন্ধুজায়া,

আপনার স্বামী শুনিলাম বাণিজ্যব্যপদেশে বহুদিনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন। আমি সম্প্রতি বিশেষ কারণে নারীদের সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু আপনাকে স্বামীর সহিত যাইবার জন্য বিশেষ অনুমতি দিলাম। মহেশ্বরের কৃপায় আপনাদের সমুদ্রযাত্রা নির্বিঘ্ন হোক। আমার আন্তরিক আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

ইতি
শুভানুধ্যায়ী
শ্রীপৃথ্বীপতি শঙ্কর সেবক।

হৈ-হৈ কাণ্ড পড়ে গেল চতুর্দিকে। অর্ণব মন্দাকিনীকে বলল— "রাজার আজ্ঞা অমান্য করা অনুচিত। আমাকে নিকষা কিন্তু রোজই স্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন। আমাকে লঙ্কা যেতেই হবে। তোমরা থাকো।

রাজা পৃথ্বীপতি কেন এ আদেশ ঘোষণা করেছেন বুঝতে পারলাম না। তবে মনে হয় নিশ্চয় কোনও নিগূঢ় কারণ আছে।"

ওরা চারজনই চুপ করে রইল। পদ্মা রাজা পৃথ্বীপতির উদ্দেশ্যে যে ভাষায় গালাগাল শুরু করল তা অশ্রাব্য। তাপ্তি তাকে আলাদা একটা ঘরে পুরে তালা লাগিয়ে দিল। খবরটা শুনে ইরাবতী মূর্ছা গেল। আর কাবেরী চলে গেল পরিচয় পাহাড়ীর কাছে। উদ্দেশ্য, যদি তাকে হাব-ভাবে ভুলিয়ে ময়ূরপংখীতে গোপনে উঠে পড়তে পারে। পাহাড়ী বলল—"তা আমি পারব না। ধরা পড়লে তোমারও মৃত্যুদণ্ড হবে, আমারও হবে। ও আমি পারব না।" মাথায় কয়েক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে ইরাবতীর মূর্ছা ভাঙানো হল। সে কিন্তু হু হু করে কাঁদতে লাগল। স্ত্রীর কাণ্ড দেখে অম্বুধি বলল—"আমিও যাব না। যদিও আমার ইচ্ছা ছিল দ্রাবিড় দেশে গিয়ে সেখানকার বড় বড় জ্যোতিষীদের সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু তুমি যখন এত কাতর হয়ে পড়েছো, আমি আর যাব না।"

এ খবর পেয়ে রত্নাকর তাঁকে অনুরোধ করে পাঠালেন—"আপনাকে যেতেই হবে। আমরা সুদূর সমুদ্র যাত্রায় যাচ্ছি। আপনার মত একজন প্রবীণ পণ্ডিত জ্যোতিষী সঙ্গে থাকলে আমরা অনেকটা নির্ভয় হব।"

"আমার স্ত্রী, আমার শালী না থাকলে আমার দেখা শোনা করবে কে? আমি নিজে তো কিছু করতে পারি না।"

রত্নাকর খবর পাঠালেন আপনার দেখাশুনো করবার জন্য দুজন ভৃত্য নিয়োগ করা হয়েছে। আপনাকে যেতেই হবে। তাছাড়া মল্লবীর সাগরও আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তিনি সর্বদা আপনার নিকট থাকবেন বলেছেন। সুতরাং আপনার পরিচর্যার কোনও ত্রুটি হবে না।

অম্বুধি রাজি হয়ে গেল। ইরাবতী কাবেরীকে মহারাজ পৃথ্বীপতির দরবারে পাঠিয়েছিল মহারাজের বিশেষ অনুমতি আনবার

জন্য। কিন্তু কাবেরী সেখানে কোনও পাত্তাই পায় নি। দ্বারপালরা তাকে ঢুকতেই দেয় নি।

বিতস্তাকে নিয়েও মুশকিলে পড়ল সাগর। মহারাজের আদেশ শুনে বিতস্তা মূর্ছা যায় নি, কান্নাকাটিও করে নি। সে সাগরকে বলল, "তুমি পরিচয় পাহাড়ীকে বলো, আমি পুরুষ বেশে রত্নাকরের রাঁধুনী হয়ে যাব। এর জন্য সে যদি কিছু টাকা চায় আমি দেব—।"

"সে রাজী হবে না। ধরা পড়লে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে।"

"তাহলে তুমি যেও না—"

"আমাকে যেতেই হবে। 'উপরিকা' দেশের হাতীকে প্রণাম করতে যাচ্ছি আমি। হাতী জানোয়ারটিকে আমি বড় ভক্তি করি। তুমি এখানেই থাকো না। এখানে তো তোমার প্রচুর কাজ।"

"প্রচুর কাজ সারাজীবন করেছি বলেই ছুটি চাই।"

"বাপের বাড়ি যাও।"

"সেখানে আমার বৌদি মারা গেছে। এক ঘর ছেলেমেয়ে। সেখানে গেলে বিশ্রাম হবে না। তাছাড়া বিশ্রাম মানেই তো ছুটি নয়; বিছানায় শুয়ে থাকলেও বিশ্রাম হয়, কিন্তু ছুটি হয় না। ছুটি একটা বিশেষ আনন্দ। সে আনন্দের সীমা থাকে না যদি রত্নাকর সঙ্গে থাকে।"

"কিন্তু তুমি যদি পুরুষ বেশে যাও, গোঁফ পরতে হবে। রত্নাকর কি চিনতে পারবে তোমায়?"

"আমার রান্না খেলেই চিনতে পারবে। আখরোটের টুকরো দিয়ে বুটের ডাল হলেই বুঝবেন, বিতস্তা এসেছে—।" সাগর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল বিতস্তার দিকে। তারপর বলল—"স্বামী হিসেবে আমার এখন উচিত তোমার চুল ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে একটি আছাড় মারা। কিন্তু তা করতে ইচ্ছে করছে না। বরং মনে হচ্ছে তুমি গেলেই ভালো হ'ত! কেন বল তো—।"

"কারণ আমার মনে পাপ নেই।"

হো হো করে হেসে উঠল সাগর।

"তোমার মনের খবর ষোল আনা জানি না। কিন্তু নিজের মনের খবর রাখি। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার খুব ভালো লাগত।"

দুজনেই হেসে উঠল এক সঙ্গে। সাগর বলল—"কিন্তু রাজ-আজ্ঞা রদ করা যাবে না। তোমাকে থাকতেই হবে এখানে।"

"কিন্তু মন আমার তোমাদের পিছু পিছু যাবে।"

"সাগর আছো?" বাইরে অগ্নির ডাক শোনা গেল।

"এসো, এসো, ভিতরে চলে এসো।"

অগ্নির হাতে একটি চমৎকার চকচকে ছোট কৌটো ছিল। "রাজার ঘোষণা শুনেছো তো? মেয়েরা কেউ যেতে পাবে না। ভোগলু তো রেগে টং হয়ে বসে আছে। আমি তাকে এই অষ্টধাতুর মন্ত্রপূত কৌটোটা দিয়ে বললাম তোমার দেহটা যখন যেতে পাবে না, তোমার মনটাই এই কৌটোর ভিতর পুরে দাও। আমি সেটা রত্নাকরকে দিয়ে দেব। সে সর্বদা তোমাকে মনে করবে। ভোগলু কৌটোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আমি ভাবলাম বিতস্তারও তো এই দশা তাই কৌটোটা কুড়িয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে এলাম। বিতস্তা যদি চায় তার মনটা এর ভিতর পুরে দিতে পারি।"

"পার নাকি? কি করে?"

"এই কৌটোটা দু'হাত দিয়ে বুকে চেপে ধরে বসে থাকো খানিকক্ষণ। একটু পরেই কৌটোর ভিতর থেকে ভোমরার গুঞ্জন শোনা যাবে। তখনই বুঝবে তোমার মন কৌটোর ভিতর বন্দী হয়ে গেছে। সেই কৌটো আমরা রত্নাকরকে দেব। রত্নাকর প্রতি মুহূর্তে তোমাকে স্মরণ করবে।"

বিতস্তা স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বলল— "দিন।"

সাগর বলল—"তুমি না হয় না-ই গেলে। ভোগবতী রেগে গিয়ে কি যে করে ফেলবে তার ঠিক নেই। তার মাথায় গোলমাল তো—।"

অঙ্কি বললে—"তার মাথার ভিতর একটা আগ্নেয়-গিরি আছে। কিন্তু আমাকে 'উপরিকা' দেশে যেতেই হবে। যে লোকটি রত্নাকরকে হাতীর খবর দিয়েছে, সেই আমাকে বলেছে যে সে দেশে চামরী, ভামরী, ঝামরী আছে, উগ্রচণ্ডা দেবী আছে। গভীর অরণ্যে তারা থাকে। তাদের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, তারা উলঙ্গিনী, তারা অদ্ভুত নাচে, অদ্ভুত সুরে অদ্ভুত ভাষায় গান করে। তারা নাকি হারানো জিনিস খুঁজে আনতে পারে—আমি তাদের কাছে এই বিদ্যেটা শিখে নিতে চাই। আমার সাতাশটা বউ আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাদের আমি ফিরিয়ে আনতে চাই। আমাকে রত্নাকরের সঙ্গে 'উপরিকা' দেশে যেতেই হবে—।"

বিতস্তা কৌটাটা নিয়ে ভিতরে চলে গিয়েছিল। সে ফিরে এসে অঙ্কির হাতে দিল সেটা।

"নিন।"

অঙ্কি কৌটোটা কানের কাছে নিয়ে শুনল একটু।

"বাঃ, চমৎকার গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দেব রত্নাকরকে।"

বিতস্তা চলে গেল ভেতরে। তারপর বিছানায় শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল সে। মনটা সত্যি হালকা হয়ে গেছে।

জলধি কবিরাজের স্ত্রী নর্মদা যা করল তা অন্য কেউ পারত না। সে হন হন করে হেঁটে চলে গেল রাজ-বৈদ্যের বাড়ি। জলধি ও অঞ্চলের নামজাদা কবিরাজ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। রাজবৈদ্য তাঁকে খাতির করেন খুব। জলধির বাড়িতে তিনি এসেছেনও কয়েকবার। নর্মদার অভ্যর্থনায় এবং সেবা যত্নে মুগ্ধ হয়ে গেছেন প্রত্যেক বারই। তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হল নর্মদা। বলল—"আপনি মহারাজকে বলে আমার জন্য একটা বিশেষ অনুমতি-পত্র জোগাড় করে দিন।"

রাজবৈদ্য একটু বিব্রতবোধ করলেন। কিন্তু রূপসী তরুণীদের প্রতি তাঁর বিশেষ একটু দুর্বলতা আছে। তাছাড়া জলধি কবিরাজের

পত্নীর অনুরোধ উপেক্ষা করবার মত মনের জোরও পেলেন না তিনি। তিনি মহারাজকে গিয়ে অনুরোধ করলেন।

মহারাজ বললেন—"তাঁকে নিয়ে আসুন আমার কাছে।"

নর্মদা গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসল মহারাজের সামনে।

মহারাজ প্রশ্ন করলেন—"আপনি সমুদ্রযাত্রা করতে চাইছেন কেন?"

"আমার স্বামীর সমস্ত ওষুধ আমিই স্বহস্তে তৈরী করি। অনেক জিনিস পিষতে হয়, কুটতে হয়, গুঁড়ো করতে হয়। আমার স্বামী দিনরাত পড়াশোনা করেন। আমার একটু বিশ্রাম নেই, জীবনে আনন্দ নেই। রত্নাকর সমুদ্রযাত্রা করছেন। আমার স্বামীও যাবেন তাঁর সঙ্গে। সেই সঙ্গে আমিও যেতে চাই। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে অনুমতি দিন।" মহারাজ বললেন—"সমুদ্র যাত্রার অনুমতি দিতে পারব না। তবে আপনার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমার একটা ছোট ময়ূরপংখী আছে। সেটা নিয়ে আপনি জলপথে যত খুশী ঘুরে বেড়ান। আমাদের দেশে বড় বড় নদ নদী আছে। আপনার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নদী পথে আমাদের দেশটা দেখে আসুন আপনি। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—।"

নর্মদা মনে মনে হতাশ হল। বাইরে কিন্তু তাকে বলতে হল—"তা হলে তো খুবই ভালো হয়। আমার কিন্তু একটু সঙ্কোচ হচ্ছে, আমার জন্যে এত হাঙ্গামা নাই বা করলেন—।"

মহারাজ বললেন—"মহারাজ হলে প্রজাদের জন্য হাঙ্গামা পোয়াতেই হয়। আর এতে কোনও হাঙ্গামাই নেই। অনেকগুলো মাঝি-মল্লা বেকার বসে মাইনে নিচ্ছে। তারা একটু কাজ করুক না। খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থা আছে ময়ূরপংখীতে। বিছানাও আছে। আপনাদের সঙ্গে কয়েকজন গায়িকাও দিচ্ছি। আনন্দে সময় কাটবে।"

নর্মদা আর কিছু বলতে পারল না। বলল—"বেশ তাই হবে।" বলে প্রণাম করে' বেরিয়ে এল। ফিরতে হল তাঁকে মহারাজের নৌকোতে। মহারাণী তার সঙ্গে অনেক উপঢৌকন দিলেন।

## ॥ ১৬ ॥

রত্নাকরের ময়ূরপংখী চলে গেছে সমুদ্র যাত্রায়। তার সঙ্গে গেছে অর্ণব, জলধি, অব্ধি, সাগর, অম্বুধি আর পারাবার। এদের প্রত্যেকের জন্য আলাদা নৌকোর ব্যবস্থা করেছে রত্নাকর। প্রকাণ্ড ময়ূরপংখীতে আছে কেবল তাপ্তি। তাপ্তি আনন্দে ডগমগ। সে যে কি করবে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তার মুখের শোভা যেন বিকশিত হয়েছে পদ্মের মত। ময়ূরপংখীর বিস্তৃত খোলা বারান্দায় সে বসে' আছে রত্নাকরের পাশে। হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া বইছে। সিন্ধু শকুনরা দলে দলে উড়ছে; তাপ্তি রত্নাকরের পাশে বসে পান সাজছে। আর মাঝে মাঝে বলছে "এত হাওয়ায় বসে' থাকা ঠিক নয়, চল ঘরের ভেতর যাই।"

"চল যাই।" অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয় রত্নাকর। তার মনে পড়ছে বিতস্তাকে। তার ছোট কৌটোটা তার পিরানের বুক পকেটে রয়েছে। সমানে গুঞ্জন করে' চলেছে সেটা। বিতস্তার সঙ্গে মনে পড়ছে ইরাবতীকে, কাবেরীকে, নর্মদাকে, ভোগবতীকে, ব্রাহ্মণীকে মন্দাকিনীকে। তাদের উৎসুক, উন্মুখ মনগুলি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তার মনের আশে-পাশে। মনে পড়ছে ফল্গুকে। সে হয়ত তার খালি বাড়ির বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। এদের জন্য মন কেমন করছে তার। ওরা সবাই তাকে ভালবাসে। কিন্তু কেন বাসে? ও তো তাদের সঙ্গে মেশেনি, তাদের প্রশ্রয় দেয়নি। বন্ধু-পত্নীদের সঙ্গে যতটুকু ভদ্রতা করা শোভন তাই করেছে শুধু। ওরা কিন্তু সবাই উতলা। চুম্বকের টানে লৌহকণা যেমন আকৃষ্ট হয়, ওরাও তেমনি হয়েছে। ভদ্রতাটা কি চুম্বক? তার মনে হচ্ছে পুরুষ না হয়ে সে যদি নারী হত তাহলে কি ওরা আকৃষ্ট হত? হত

না। তাপ্তিকেই সে ভালবাসে। তাদের ভালবাসা এর মধ্যে এসে জুটে গেছে। কারণ সে রূপবান পুরুষ এবং ভদ্রলোক।

মহারাজা পৃথ্বীপতি এ কৌশল না করলে তার সমুদ্র-যাত্রা জটিল সমস্যা হয়ে উঠত। তাপ্তি খুব খুশী হয়েছে। রত্নাকরের কিন্তু মন কেমন করছে ওদের জন্য। বিচিত্র মানুষের মন।

ময়ূরপংখীতে ছোট একটি মহেশ্বরের মন্দির ছিল। রত্নাকর সেই মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তাপ্তির ইচ্ছে ছিল ঘরে গিয়ে বিছানার উপর বসে' রত্নাকরের সঙ্গে পাশা খেলবে। কিন্তু তা আর হল না। রত্নাকর মহেশ্বরের মন্দিরে ঢুকে পড়ল। তাপ্তির মনে হল— রত্নাকর কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। কেন? এই প্রশ্নের পিছু পিছু তার মনে যে ছবি ফুটে উঠল তাতে তার দুঃখও হল, আনন্দও হল। সে বুঝল ওই বেহায়া মেয়েগুলোর জন্যেই তার স্বামীর মন কেমন করছে। দুঃখে ভরে গেল মনটা। কিন্তু তারপরই মনে হল ওদের সে কাছে ঘেঁসতে দেয় নি। কিছুদিন দেখতে না পেলেই ভুলে যাবে ওদের। মহারাজা পৃথ্বীপতিকে মনে মনে প্রণাম করল বার বার। তারপর সহসা তার মনটা খুশীতে ভরে উঠল। ঘরে গিয়ে করতাল বাজিয়ে সে গান ধরে দিল—মোহন মতির মালা কেবল আমার গলায় দুলবে। তাপ্তি খুব ভালো গায়িকা। সহসা তার সমস্ত মনটা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

## ॥ ১৭ ॥

মহাশ্মশানে চারদিকে ধুনী জ্বালিয়ে ভোগবতী বসে' আছে একা। ধ্যান করছে চোখ বুজে। তার গলায় হাড়ের মালা। কোলের উপর খুলি। সে মাঝে মাঝে খুলিটাকে তুলে চুম খাচ্ছে। তার মাথার ভিতর থেকে একটা লাল রঙের শিখা বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একটা রক্ত-গোক্ষুর লকলক করে' ফণা বিস্তার করছে। সহসা একটা ঝাঁকড়া চুল-ওলা রোমশ বলিষ্ঠ লোক আবির্ভূত হল শূন্য থেকে। তার চোখ দুটো জ্বলছে। অগ্নি-গোলকের মতো। নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। ধুনীর থেকে কিছু দূরে দুটো বাঘ থাবা পেতে বসে' আছে নিস্পন্দ হয়ে।

ভোগবতী বাহ্যজ্ঞানশূন্য। সে মাঝে মাঝে কেবল মড়ার খুলিটাকে চুম খাচ্ছে। যে লোকটি শূন্য থেকে নেমে এসেছে, তার সম্বন্ধেও সে উদাসীন। তখন সেই লোকটির ভিতর থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ বেরুতে লাগল। তখন ভোগবতী তার দিকে চেয়ে দেখল।

"কে তুমি ?"

"আমি মহা-ঝঞ্ঝা। বরুণ দেবের আদেশে আপনার কাছে এসেছি। আপনি যা বলবেন, তাই আমি করব।"

"আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। রত্নাকর, অদ্ধি, আর তাপ্তি আমাকে অপমান করেছে। আমাকে না নিয়ে ময়ূরপংখী ভাসিয়ে প্রকাণ্ড নৌবহর নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করেছে তারা। তুমি বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড় তাদের উপর। তাদের নিশ্চিহ্ন করে' দাও। তারা বুঝুক যে ভোগবতীকে উপেক্ষা করা যায় না।"

লোকটি বলল—"বেশ তাই হবে।" বলেই সে অন্তর্দ্ধান করল। তারপরেই আবির্ভূত হল আর একজন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি তার।

অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে তার দেহটা যেন একাকার হয়ে গেছে। চোখ মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরণ হচ্ছে মাঝে মাঝে।

"তুমি কে?"

"আমি মহামেঘ। আমাকে দেবরাজ ইন্দ্র আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন—আমি তাই করব। আপনি মহাঝঞ্ঝা দেবকে এখুনি যে আদেশ দিলেন তা আমি শুনেছি। আমাকেও কি তাই করতে হবে?"

"হ্যাঁ, তাই করতে হবে। ময়ূরপংখী আর নৌবহর আমি ধ্বংস করতে চাই। তুমি মহাঝঞ্ঝা দেবের সহকারী হও—।"

"আপনার আদেশ বর্ণে বর্ণে পালিত হবে।"

মহামেঘ অন্তর্দ্ধান করল।

ভোগবতী অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর চিৎকার করে বলতে লাগল—"রক্তদশনা মহাকালী এবার আমাকে ধ্বংস কর। আমার এই যৌবন, আমার এই রূপ, আমার এই হাস্য-লাস্য, অগ্নিকে বাঁধতে পারেনি। রত্নাকরকে মুগ্ধ করেনি। এ সব ধ্বংস কর, ধ্বংস কর।" তার মাথায় যে রক্ত গোক্ষুর ফণা তুলে বসেছিল সে দংশন করল ভোগবতীকে। আর সেই নিস্তব্ধ বাঘ দুটো লাফিয়ে পড়ল তার উপর। ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তার দেহ। তারপর ভীষণ একটা শব্দ হল। শ্মশানের খানিকটা ফেটে গেল। ফেটে গিয়ে বসে' গেল সেটা, ভোগবতী পাতালে চলে গেল।

তিন্তিড়ী বিমর্ষ হয়ে বসেছিল নিজের ঘরে। সমুদ্রের উপর যে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে তার ঝাপটা এ অঞ্চলেও এসেছে। সমুদ্রের উপর ঝড়-বৃষ্টির যে তুমুল তাণ্ডব হয়ে গেছে সে খবরও পেয়েছে তিন্তিড়ী। রত্নাকর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তার জন্যে উৎকৃষ্ট গাঁজা সে নিয়ে আসবে। কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তার কবল থেকে রত্নাকরের নৌবহর রক্ষা পেয়েছে কি? এ অঞ্চলের অনেক লোক গেছে রত্নাকরের সঙ্গে। সকলের বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। অবশ্য সঠিক খবর কেউ পায়নি। সেকালে খবরের কাগজ ছিল না। তবে সকলেই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। তিন্তিড়ীর আর একটা অসুবিধা হয়েছে। গাঁজার খদ্দের অনেক কমে' গেছে। অনেক গাঁজাখোর চলে' গেছে রত্নাকরের সঙ্গে। তার ভাণ্ডারে গাঁজাও বাড়ন্ত। এমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না যে রাখম্‌পুরের বাজার থেকে গাঁজা এনে দেয়। খুব ভালো গাঁজা অবশ্য খানিকটা আছে, কিন্তু সে গাঁজার দাম এত বেশী যে তার চাহিদা বেশী হয় না। গাঁজাটা কড়াও খুব। অনেকে সহ্য করতে পারে না। ঝানু গাঁজাখোর হরিশ্চন্দ্র দ্বিবেদী একটান খেয়ে তিনদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তিন্তিড়ী ঘরে বসে এইসব ভাবছিল। এমন সময় হুম, হুম, হুম করে ডেকে উঠল পেঁচাটা। তিন্তিড়ী বুঝল রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ভাবল এবার কপাট বন্ধ করে' শুয়ে পড়া যাক। যদিও শুলে এখন ঘুম আসবে না, কিন্তু তবু শুয়ে পড়াই ভালো। চোখ বুজে মহেশ্বরের ধ্যান করতে করতে ঘুম এসে যাবে একটু পরে। কপাট বন্ধ করতে গিয়ে দেখে কপাটের সামনে কমণ্ডলু হাতে ভৃঙ্গী দাঁড়িয়ে আছে। কুচকুচে কালো রং। তিন্তিড়ীকে দেখে ভৃঙ্গী আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি

হাসলেন। মনে হল একটা কুচকুচে কালো বড় মুক্তকেশী বেগুনের পেঠটা কেটে কে যেন ফাঁক করে' দিল সেটা।

"কি তিন্তিড়ী আমাকে চিনতে পারছ?"

তিন্তিড়ী তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল তাঁকে।

"আপনাকে কি ভুলতে পারি। আপনাকে গঞ্জিকা সেবন করিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলাম একদিন।"

"আজও খাওয়াও। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে মহেশ্বরের আদেশে। প্রথমে গেলাম মন্দর পর্বতের সম্মতি নিতে। অনেক ইতস্তত করে তিনি সম্মতি দিলেন। তারপর গেলাম অনন্তনাগেব কাছে। অনন্তনাগের সম্মতি পেয়ে গেলাম সহজে। তারপর গেলাম মহাকুর্মের কাছে। তিনিও সম্মতি দিলেন। এখন যেতে হবে সুমেরু পর্বতে। সেখানে মহেশ্বর, বিষ্ণু, আর ব্রহ্মা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তাদের খবর দিতে হবে—যে এঁরা তিনজনই অবশেষে সম্মত হয়েছেন। প্রথমে রাজী হচ্ছিলেন না—।"

"ব্যাপার কি, বুঝতে পারছি না।"

"সমুদ্র-মন্থন হবে।"

"সমুদ্র-মন্থন? কেন?"

"দেব এবং দৈত্যরা মহাদেবকে গিয়ে ধরেছিলেন—আমরা সুধাপান করে অমর হতে চাই, আপনি তার ব্যবস্থা করুন। মহাদেব বললেন, প্রত্যেক জিনিসই নিজের বীর্যবলে অর্জন করতে হয়। সুধা আছে সমুদ্রের তলায়। সমুদ্র-মন্থন করো, সুধা পাবে। দেবতারা দৈত্যরা একথা শুনে হকচকিয়ে গেল। বলল—সমুদ্রকে মন্থন করব কি করে? মহাদেব বললেন, আচ্ছা, ভেবে বলছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সুমেরু পর্বতে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন কি করে' এ দুরূহ কাজ সম্ভব করা যায়। সভার পর সভা বসতে লাগল। ভালো কথা, তুমি আগে এক কলকে সাজো দেখি। বড় ক্লান্ত লাগছে। এক টান দিয়ে তারপর বাকীটা বলব।—"

ভৃঙ্গী ঘরের ভিতর ঢুকে তিন্তিড়ীর খাটের উপর বসলেন। তিন্তিড়ী তখন লক্ষ্য করল ভৃঙ্গীর সর্বাঙ্গে বড় বড় লোম রয়েছে। গোঁফ দাড়ি তো আছেই। তিন্তিড়ী তাড়াতাড়ি একটা বড় কলকে নিয়ে সাজতে বসে' গেল।

প্রকাণ্ড একটা টান দিয়ে দম বন্ধ করে' বসে রইলেন ভৃঙ্গী। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন নাক দিয়ে। সব ধোঁয়া যখন বেরিয়ে গেল তখন তিন্তিড়ীর পিঠ চাপড়ে বললেন—"বাঃ, খাসা মাল রেখেছ তুমি। এক টানেই চাঙ্গা করে দিয়েছে আমাকে। আমার গাঁজা একদম ফুরিয়ে গেছে। দীর্ঘজীবি হও।"

"আপনার গল্পটা এবার বলুন।"

"গল্প কি হে, এ সত্যি কথা। শোন তবে। ওঁরা তিনজনে মিলে শেষে ঠিক করলেন যে মন্দর পর্বত ছাড়া আর কেউ মন্থন-দণ্ড হতে পারবে না। মন্দর পর্বত এগারো হাজার যোজন উঁচু, আর মাটির নীচেও পোঁতা আছে এগারো হাজার যোজন। কিন্তু এ পর্বতকে তুলে সমুদ্রের ধারে আনবে কে? আর মন্থন-রজ্জুই বা কোথা পাওয়া যাবে?"

বিষ্ণু বললেন—পরম ভক্ত অনন্তনাগ মহাতপস্বী এবং মহা-শক্তিশালী। সে যদি রাজী হয় মন্দর পর্বতকে উপড়েও আনতে পারবে। মন্থন রজ্জুও হতে পারবে। মহেশ্বর যদি অনুরোধ করেন তাহলে সে সম্ভবত রাজী হয়ে যাবে। ব্রহ্মা এইবার বাগড়া লাগালেন। বললেন, সমুদ্র মন্থন করলে কত প্রাণী হত্যা হবে তা হিসেব করেছ? এরা সুধা খেয়ে অমর হবে বলে আমার সৃষ্টিটা কি তোমরা তছনছ করে' দেবে? সমুদ্র মন্থন করলে তো মহা প্রলয় হবে। সমুদ্রের ভিতর যে সব অপূর্ব প্রাণী আমি সৃষ্টি করেছি একটাও বাঁচবে না। আর একটা কথা তোমরা ভেবে দেখছ না। আমার চোখে দেবতা আর দৈত্য দুইই সমান। অদিতি এবং দিতির

বংশধর এরা। কিন্তু দৈত্যরা বেশী বলবান। তারা যদি সুধা পান করে' অমর হয় তাহলে তো দেবতাদের মেরে ছাতু করে' দেবে। তারা মরবে না, ছাতুর স্তূপ হয়ে থাকবে। সেটা কি বাঞ্ছনীয়? ভালো করে' ভেবে দেখ তোমরা।

মহেশ্বর বললেন—বেশ ভেবে দেখা যাক। কিন্তু এর আর একটা দিক আছে। দেবতাদের মধ্যে এবং দৈত্যদের মধ্যে অনেকে আমাদের পরম ভক্ত। অনেককে আমি খুব ভালবাসি। তাদের একটা আবদার যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে দেবাদিদেব হয়েছি কেন? শূন্যকুম্ভ হয়ে পূর্ণকুম্ভের অভিনয় আমি করতে পারব না। আমার আত্মসম্মান রক্ষা করবার জন্য আমি একটা কেন দশটা মহাপ্রলয় করতেও পিছুপা নই। বিষ্ণু বললেন—আচ্ছা ভেবে দেখা যাক। এইভাবে সভার পর সভা হতে লাগল। কিন্তু কোনও মীমাংসা হয় না। ব্রহ্মা শেষে বললেন—আমরা মহেশ্বরের উপর ভার দিয়ে দিচ্ছি, সেই যা ভালো মনে করে করুক। একটা সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেললে আর একটা অভিনব সৃষ্টি আমি করতে পারব। কিন্তু আর সভার পর সভা আমি করতে পারব না। আমি চললাম। ব্রহ্মা চলে' যাবার পর বিষ্ণু বললেন—আপনি যা ঠিক করবেন তা আমিও মেনে নেব। মহাদেব চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—আচ্ছা ভেবে দেখি। এই নিয়ে ভাবাভাবি দিন কয়েক চলল। মহাদেব হঠাৎ কাল আমায় আদেশ দিলেন—তুমি গিয়ে ভালো করে জেনে এস মন্দর পর্বত, অনন্তনাগ আর মহাকূর্ম ঠিক রাজি আছে কিনা।

"মহাকূর্ম কি করবে?"

"মহাকূর্ম বিরাট বিশাল কাছিম একটা। সে সমুদ্রের ভিতর নেবে যাবে। তারপর অনন্তনাগ মন্দর পর্বতকে তার উপর বসিয়ে জাপটে ধরবে তাকে। তারপর মুখের দিকে দৈত্যরা আর ল্যাজের দিকে দেবতারা ধরে' মন্থন করবে সমুদ্রকে। আমি আজ ওদের

তিনজনের কাছে গিয়েছিলাম। ওরা সম্মত হয়েছে। এই খবরটি মহাদেবকে দিতে যাচ্ছি। তুমি আর এক কলকে সাজ।”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, দিচ্ছি। এতবড় একটা কাণ্ড হবে, আমি দেখতে পাব না?”

“তুমি দেখতে চাও, তোমাকে দেখাব। নিয়ে যাব তোমাকে সুমেরু পর্বতে। সেখানে বসে সব দেখতে পাবে তুমি। তবে কবে যে মন্থন শুরু হবে তা তো জানি না। মহেশ্বর যেদিন ঠিক করবেন সেইদিনই হবে। সেইদিন তোমাকে সুমেরু পর্বতে নিয়ে যাব।”

“আমি কি যেতে পারব?”

“আমার অনেক চেলা আছে। তারা তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে। তুমি ভেবো না। তাড়াতাড়ি সেজে ফেল আর এক কলকে। আমাকে এখন কৈলাসে যেতে হবে। মহেশ্বর সেখানে আমার অপেক্ষায় বসে আছেন।”

তিন্তিড়ী তাড়াতাড়ি আর এক দলা গাঁজা হাতে নিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে দলতে লাগল।

॥ ১৯ ॥

ব্রাহ্মণী নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল তার ঘরে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। তার মনে যে বিপ্লব চলছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত। মাটিতে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে তার কপাল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। নিজের দাঁত দিয়ে দুহাত কামড়ে কামড়ে হাত দুটোকেও ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। নিজেকে শাস্তি দিচ্ছিল সে। সে এখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল সে অসতী। পারাবারের মত দেব চরিত্র লোকের স্ত্রী হবার যোগ্যতা তার নেই। সে সারা-জীবন স্বামীর সঙ্গে ভণ্ডামি করে এসেছে। যদিও রত্নাকর কোনও দিন তার অঙ্গ স্পর্শ করে নি, তবু মনে মনে সে তাকে অহরহ কামনা করছে। সে মনে মনে অসতী। হঠাৎ সে নিজের গালে ঠাস্ ঠাস্ করে চড় মারতে লাগল। ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল তার দুচোখ দিয়ে। কপালের রক্ত আর চোখের জল মিশে সমস্ত মুখটা বিভৎস হয়ে উঠল।

হঠাৎ সে দেখতে পেল পারাবার তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অশরীরী স্বচ্ছ পারাবার। চীৎকার করে উঠল ব্রাহ্মণী—"তুমি ছুঁয়ো না আমাকে। আমি অসতী, আমি ছাগী, আমি কুক্কুরী। আমি পাপীয়সী। আমাকে স্পর্শ কোর না। তুমি কবি, তুমি সুন্দরের উপাসক, তুমি স্রষ্টা, আমি তোমার যোগ্য সহধর্ম্মিণী হ'তে পারিনি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—" ক্রমাগত মাথা কুটতে লাগল সে। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরদিন সকালে সবাই দেখল ব্রাহ্মণী আত্মহত্যা করেছে। ঘরের আড়কাটা থেকে তার উলঙ্গ দেহটা ঝুলছে। নিজের শাড়ি পাকিয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে সে।

জলধির স্ত্রী নর্মদা তার স্বামীর ওষুধগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখছিল। সে-ই দিবারাত্রি খেটে এসব তৈরী করেছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতি তার অনুরাগ আছে বলেই নয়, করেছিল সে স্বামীকে ভালোবাসে বলেই। তার খামখেয়ালী স্বামী যে কত বড় প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কত বড় পণ্ডিত, কত রকম নূতন ওষুধের স্রষ্টা তা সে জানত। আদা, নিম, মধু, আর গোলমরিচ দিয়ে সে যে অদ্ভুত বড়ি তৈরী করেছিল তাতে বহু রোগী দুরারোগ্য অজীর্ণ রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে—তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। কত রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ওষুধ সে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করবার জন্য দিবারাত্রি কত পড়াশোনা করেছে তা নর্মদার থেকে আর বেশী কে জানে। লেখা-পড়ায় ব্যস্ত স্বামীকে দেখলে তার মনে হত ও সাধারণ লোক নয়—ও তপস্বী। চিকিৎসা জগতের দুর্গম অরণ্যে তন্ময় হয়ে বিচরণ করতে দেখেছে তাকে নর্মদা। জোর করে তাকে নাওয়াতে হ'ত, খাওয়াতে হত। এই একনিষ্ঠ সত্য-সন্ধী দেবতাকে সত্যিই ভক্তি করত নর্মদা। তাঁর আদেশে তাই সে অনেক কটুগন্ধ ভেষজ বেটেছে, কুটেছে, সিদ্ধ করেছে—তার কষ্ট হত খুব, তবু সে করেছে স্বামীকে ভক্তি করত বলে, ভালবাসত বলে।

রত্নাকরকেও সে ভালবাসত। সে ভালবাসায় কোনও লুকোচুরি ছিল না, গ্লানি ছিল না। রত্নাকরের রূপে, গুণে, ভদ্রতায় সে মুগ্ধ হয়েছিল। তার সান্নিধ্য তার ভাল লাগত। তার কাছে গেলে মনে হত কোনও সুগন্ধ ফুলবাগানে সে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এতে দোষ কি? মহারাজা একরকম একটা আদেশ দিলেন কেন? তাপ্তিকে বিশেষ অনুমতি দিয়েছেন, আর কাউকে দেন নি কেন? তাছাড়া তিনি মহারাজা হয়েছেন বলে কি আমাদের স্বাধীনতা হরণ করবেন? আমরা কি তার বাঁদী? মানব না তাঁর এ আদেশ। সমুদ্র-যাত্রা তিনি করতে দেবেন না? আমি সমুদ্রের ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে যাব। দিবারাত্রি হাঁটব। মহেশ্বরের রাজত্ব পার হ'য়ে

গিয়ে নৌকো ভাড়া করব। সেই নৌকো করে' আমি রত্নাকরের নৌবহরকে ধরবই।

"ফাগুন—"

ডাক শুনে তাদের বাগানের মালী ফাগুন এসে দাঁড়াল। বলিষ্ঠকায় প্রৌঢ় শবর একজন।

"তুমি এই বাড়ি নিয়ে থাকো। আমাদেব জমি থেকে যা আয় হয় তা তোমরাই নিও। আমি কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে বেরুচ্ছি—।"

"যে আজ্ঞে। আমি ভার নিলাম। আপনি কিসে যাবেন?"

"আমি হেঁটে যাব। তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে তো?"

"আছে—।"

"গাছপালা গুলোতে সার জল দিও। আকন্দ গাছে অনেক ফুল হয়েছে। সেগুলো তুলে শুকিয়ে রেখে দিও।"

"রাখব।"

ফাগুন চলে গেল। নর্মদা পেটিকা থেকে কিছু অর্থ বার করে এক বস্ত্রে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। হন হন করে হাঁটতে লাগল হিরন্ময়ী নদীর দিকে। হিরণ্ময়ী সাগরে গিয়ে মিশেছে।

অম্বুধির স্ত্রী ইরাবতী এবং তার বিধবা বোন হঠাৎ যেন বেকার হয়ে পড়েছে। তাদের তুজনেরই মনে হল মস্ত বড় একটা দাঁও ফসকে গেল যেন। রত্নাকরের মত ধনী দিলদরিয়া রূপবান লোকের সঙ্গে তার ময়ুরপংখীতে চেপে দীর্ঘকাল সমুদ্রের উপর ভাসতে ভাসতে যে মজা তারা লুটবে ভেবেছিল তা হঠাৎ নাগালের বাইরে চলে' গেল। কাবেরীর মনোভাব মৎস শিকারীর মত। সে মনে মনে কল্পনা করছিল যে একটা বড় রুইমাছ তার বঁড়শি গিলেছে, আস্তে আস্তে এবার খেলিয়ে তুলতে হবে। হঠাৎ মাছটা যে এক ঝটকায় সূতো ছিঁড়ে পালাবে এ সে ভাবতেও পারেনি। রত্নাকরের নৌবহর যখন চলে গেল

তখন ইরাবতী বুক চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। কাবেরী কাঁদল না। ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে বসে রইল নীরব হয়ে। চোখের দৃষ্টি থেকে আগুনের হলকা বেরুতে লাগল। সে ঠিক করে ফেলল এখানে আর থাকবে না। নিজের শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে। সেখানে তার এক বিপত্নীক দেওর আছে। আছে যদু পুরোহিতের ছেলে মাধব। আছে জমিদার নায়েব কান্তি-শশাঙ্ক। এদের অতি মনোযোগের ধাক্কাতেই সে পালিয়ে এসেছিল তার দিদির কাছে। এসে দেখেছিল রত্নাকরকে। দেখে মজেছিল। কিন্তু রত্নাকর ফসকে গেল। এখন শ্বশুরবাড়িতেই ফিরে যাওয়া যাক। যৌবন তো চিরকাল থাকবে না। দেহ বুভুক্ষিত, মন পিপাসিত। এখানে থেকে লাভ কি।

সে ইরাবতীকে বলল—"দিদি, আমি রঙ্গনপুরে ফিরে যাচ্ছি। এখানে আর ভালো লাগছে না।"

ইরাবতী চুপ করে রইল। তারপর বলল—"যেতে চাও, যাও। আমি তোমাকে বারণ করব না। তুমি নিজেই এসেছিলে, নিজেই চলে যাচ্ছ। আমার বলবার কিছু নেই।"

"তুমি কি করবে?"

"আমি স্বামীর ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকব। আমাদের এত জমি, এত বড় গুড়ের ব্যবসা—তাই নিয়েই থাকব আমি।"

কাবেরী যখন চলে' গেল, তখন চুপ করে' বসে রইল ইরাবতী। অনেকক্ষণ চুপ করে' বসে রইল। তার অসমর্থ অসহায় স্বামীকে সে তার পাণ্ডিত্যের জন্য খুব শ্রদ্ধা করত। শুধু জ্যোতিষ শাস্ত্রেই নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরাট পণ্ডিত অম্বুধি। বিবাহের পর ইরাবতীকে সংস্কৃত পড়িয়েছিলেন, জ্যোতিষশাস্ত্রও শিখিয়েছিলেন কিছু কিছু। ইরাবতী তাঁর পত্নীই নয় কেবল, শিষ্যাও ছিল। ইরাবতী সত্যিই শ্রদ্ধা করত তাঁকে। সে তার প্রণয়িনী হতে পারেনি। সে তাকে ভালবাসত, কিন্তু সে ভালবাসায় প্রণয়ের উন্মাদনা ছিল না, ছিল জননীর স্নেহের স্নিগ্ধতা। ওই পঙ্গু অসহায় বিদগ্ধ লোকটিকে ঘিরে

তার মাতৃত্বই যেন সদাজাগ্রত ছিল। রত্নাকরকে প্রথম যেদিন সে দেখে সেইদিনই সে প্রথম বুঝতে পেরেছিল প্রেম কি। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা যেমন নিমেষে সোনা হয়ে যায়, অনেকটা তেমনি হল যেন তার। তাকে ঘিরে সে কত সোনার স্বপ্নই যে রচনা করেছে। আশা ছিল এই সমুদ্র যাত্রায় সে তার আর একটু কাছে আসতে পারবে। হয়ত তার হৃদয়ও জয় করতে পারবে। রাজার আদেশে হঠাৎ নাগালের বাইরে চলে' গেল সব। রত্নাকর আবার কবে ফিরবে, তার স্বামীর সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা এ সবই কেমন যেন অনিশ্চিতের অন্ধকারে আবৃত হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে সমুদ্রে নাকি ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। রত্নাকরের নৌবহর সে ঝড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে কি না কে জানে। ইরাবতীর মন যেন দিশাহারা হয়ে পড়ল। যার জন্যে এত আশা করে বসে আছে সে কি আর আসবে না? সহসা জয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা মনে পড়ল—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযাণং
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং
পশ্যতি তব পন্থানম্।

এই শ্লোকটি মনের মধ্যে গুঞ্জরণ করে উঠল সহসা। তন্ময় হয়ে আবৃত্তি করতে লাগল সে কবিতাটি। তার মনে হল তার দয়িতকে সে ওই কবিতার মধ্যেই যেন পেয়েছে। রত্নাকরই যেন বনমালী, তার অপেক্ষায় যমুনা তীরে নির্জন কুঞ্জবনে শয্যা রচনা করে অপেক্ষা করছে। তার মানস লোকের সেই যমুনা তীরে সে মনে মনে চলে গেল, দেখতে লাগল রত্নাকর তার অপেক্ষায় বসে' আছে। তার জন্যে শয্যা রচনা করছে—। কাব্যের ভিতর দিয়ে রত্নাকরের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল ইরাবতী। তারপর সহসা একটা পথও পেয়ে গেল সে। কাব্যের ভিতর দিয়েই সে রত্নাকরকে স্পর্শ করবে। খুঁজে খুঁজে বের করল গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, আর অভিজ্ঞান

শকুন্তলম্, স্বপ্নবাসবদত্তা। ঠিক করল এদের ভিতর দিয়েই আমি মিলিত হব রত্নাকরের সঙ্গে। কোনও রাজার আদেশ সে মিলনে বাধা স্থষ্টি করতে পারবে না। সে মেঘদূত খুলে বসল।

বিতস্তাও হতাশ হয়েছিল। কিন্তু তার বেশী মন কেমন করছিল তার মল্লবীর স্বামীর জন্যে। বিতস্তাকে নিয়ে লোফালুফি করত সে। যখন বুকে চেপে ধরত—মনে হত পিষে ফেলবে বুঝি। দম বন্ধ হয়ে যেত। তার জীবনের সাধনা ছিল শক্তি। সে মনে করত যার শক্তি নেই, সে অমানুষ, সে কৃপার পাত্র। সে বার বার বলত—শক্তির উপরই মহত্ত্বের আসন। শক্তিই পৃথিবীতে সমস্ত মহত্ত্বের ভিত্তি। শক্তিই পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য। বিতস্তাকে মাঝে মাঝে বলত—তোমার বিতস্তা নামটা খারাপ নয়, কিন্তু একটু সৌখীন গোছের। তোমার নাম কালী, দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী হলে আমি আরও খুশী হতাম। সারাজীবন শক্তির চর্চাই করছে সে। তার এই বীর শক্তিমান স্বামীকে সে নিত্য নূতন রকম রান্না করে খাওয়াত। সাগর একটি জিনিস খেত রোজ। কোনদিন ডাল, কোনদিন পায়েস, কোনদিন ছানার ডালনা—রোজ নূতন কিছু হওয়া চাই। তার একটি প্রকাণ্ড রুপোর গামলা ছিল। সেই গামলায় এক গামলা খাবার দিতে হত তাকে। যেদিন মাংস খেত সেদিন তারজন্য আলাদা একটি ছাগ-শিশু বলি দিতে হ'ত মা-কালীর মন্দিরে। পুরোটাই খেয়ে ফেলত সে। তার এই স্বামীর জন্যেই বেশী কষ্ট হতে লাগল তার।

বিতস্তা শ্যামবর্ণা, ছিপছিপে গড়ন, অপরূপ মুখশ্রী, এক পিঠ চুল। হাসিটি সুন্দর, দাঁতগুলি মুক্তোর মত। চোখের দৃষ্টি স্বপ্নময়। সে শিল্পী। কি করে তার স্বামীকে নিত্যনূতন খাবার খাওয়াবে এই চিন্তাই তার একমাত্র চিন্তা ছিল এতদিন। কিন্তু সে রত্নাকরকেও

ভালোবেসেছিল। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের মধ্যে সে দেখত রত্নাকরকে। শুধু দেখত না, পূজো করত মনে মনে। সে পূজোর মধ্যে কাম বা লালসা হয়ত প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু সেইটাই তাকে অভিভূত করে নি। অজ্ঞাতসারে সে সব কথা তার মনেও হয় নি কখনও। মনে মনে সে সবিস্ময়ে চেয়ে থাকত—ওই সূর্য্যেরই দিকে। মনে মনে বলত—তুমি সুন্দর, তুমি উজ্জ্বল, তুমি মহৎ, তুমি বৃহৎ, তুমি জ্যোতির উৎস। তুমি বর্ণের জন্মদাতা। তোমার কাছে আসতে পেরেছি, তোমাকে রেঁধে খাইয়েছি, তুমি আমাকে বন্ধুপত্নীরূপে সমাদর করেছ, এতেই আমি ধন্য। তুমি আমাকে তোমার ময়ুরপংখীতে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করবে বলেছিলে—যা আমার সুদূরতম কল্পনার অতীত ছিল, সেই সম্ভাবনার আশ্বাস দিয়েছিলে তুমি। আনন্দে আত্মহারা করেছিলে আমাকে। হঠাৎ সব ভেঙে গেল। এই সব কথাই সে ভাবছিল বসে বসে। এমন সময় বান্ধবী উল্‌কি এল।

"আজ রান্নাঘরে যাও নি যে—"

"কার জন্যে রাঁধব বল। যার জন্যে রোজ রান্নাঘরে যেতাম সে তো আমাকে ফেলে চলে গেছে।"

উল্‌কি তার পাশে এসে বসল। চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। সে কুম্ভকার কন্যা। কুমারী এবং শিল্পী। পুতুল গড়ে, প্রতিমা গড়ে, মূর্তি গড়ে। এই জন্যেই বিতস্তার সঙ্গে তার ভাব। বিতস্তার শিল্পীমন মুগ্ধ হয়েছিল উল্‌কির শিল্প-প্রতিভা দেখে। গরীবের মেয়ে উলকি। বিতস্তার কাছেই সে খায় দু-বেলা। রাত্রে শোয় তার পিসেমশায়ের বাড়িতে। পিসেমশাই বিশ্বম্ভর মাটির বাসন তৈরি করে নানারকম। তার বাবাও বিতস্তার বাড়িতে খায়। অনেক লোক খায় সাগরের বাড়িতে। তাদের জন্য আলাদা রন্ধন-শালা আছে, আলাদা রাঁধুনী আছে।

উল্‌কি হঠাৎ বলল—"তুমি এতদিন আমাকে রেঁধে দিয়েছ। আজ আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াই। কেমন?"

"খাওয়াও। আমার নিজের কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। কি রাঁধবি তুই ?"

"আমি তো তোমার মত রাঁধতে পারব না। মটরশুঁটি দিয়ে মুগের ডালের খিচুড়ি রাঁধি। আর তার সঙ্গে ব্যাসন দিয়ে বেগুনি। তোমাদের রান্না ঘরে মৌরলা মাছ এসেছে দেখলাম। সেখান থেকে তাই নিয়ে আসি কিছু। খিচুড়ির সঙ্গে মৌরলা মাছ ভাজা—।"

"উনি না ফেরা পর্যন্ত মাছ আমি খাব না। তবে তোর যদি খেতে ইচ্ছে হয় নিয়ে এসে ভাজ কিছু।"

"তুমি সধবা মানুষ, মাছ খাওয়া ছেড়ে দেবে ? স্বামীর অমঙ্গল হবে যে তাতে।"

"আমার কেন যেন মনে হচ্ছে উনি আর বেঁচে নেই। রত্নাকরের নৌ-বহর ঝড়ে ডুবে গেছে। রত্নাকরও বেঁচে নেই। তাঁকেও ভালোবাসতাম দেবতার মত। আমার স্বামীকে আগে খাইয়ে তবে আমি খেতাম। ভাল খাবার করলেই পাঠিয়ে দিতাম রত্নাকরকে। তাঁদের জন্যেই রান্না করতাম। ওঁরা ভালো বললে আমার কি আনন্দ যে হত তা তোকে বোঝাব কি করে ? আমার নিজের জন্যে কোনও ভালো রান্না আমি আর করব না এজীবনে। কারণ আমার মনে হচ্ছে তাঁরা আর ফিরবেন না।"

উল্‌কি বলল—"আমার গুরু-ঠাকুর বলেন মানুষের দেহটাই মরে যায়। আত্মার মৃত্যু নেই। তিনি একদিন বলছিলেন আমরা মাটির ঠাকুরের ভিতর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি ভক্তির জোরে। ভালোবাসার টানে দেবতা যদি আসতে পারেন মানুষও পারবে না কেন ?"

উৎসুক হয়ে উঠল বিতস্তা। বলল—"দেবতারা মাটির প্রতিমায় আসেন এটা কি সত্যি ?"

"সত্যি ! আমি দেখেছি আমার ঠাকুর মশাই যখন তাঁর ইষ্ট-দেবতা নারায়ণকে প্রণাম করেন তখন নারায়ণ ঝুঁকে আশীর্বাদ করেন তাঁর মাথায় হাত দিয়ে। আমি আড়াল থেকে দেখেছি একদিন।"

"সত্যি ?"

"সত্যি। আমি তোমার স্বামীর মূর্তি গড়ব। তুমি তাঁর সামনে বসে ধ্যান কর। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন আমার মূর্তির ভিতর। তখন তুমি তাঁকে রান্না করে' ভোগ দিও। তারপর তাঁর প্রসাদ পাব আমরা দুজনে।"

"তুই পারবি মূর্তি গড়তে ?"

"নিশ্চয় পারব।"

"রত্নাকরের মূর্তি ?"

"তা—ও পারব।"

"তাহলে দুটো মূর্তি গড়। রত্নাকরকেও আমি ভালবাসি তাঁকেও রান্না করে' খাইয়েছি। তাঁর জন্যেও মন কেমন করছে—।"

"বেশ, দুজনেরই মূর্তি গড়ে দেব আমি। তুমি তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর।"

"মূর্তি করতে তো সময় লাগবে।"

"তা লাগবে বই-কি—।"

"তা হলে আজ থেকেই শুরু কর। যতদিন মূর্তি তৈরী হচ্ছে ততদিন আমি দুধ আর ফল খেয়ে থাকব। মূর্তি তৈরি হলে রান্না ঘরে ঢুকব। তুই কি খাবি ? আমি রাঁধুনিকে ডেকে পাঠাই—।"

"আমিও দুধফল খাব।"

"চল তাহলে তোর বাড়িতে যাই। দুজনেই আরম্ভ করে দিই।"

"মূর্তি তোমার বাড়িতেই গড়ব। আগে মাটি তৈরি করতে হবে। আমি মাটি নিয়ে আসি। একটা চাকর বরং দাও আমার সঙ্গে। দু'-ঝুড়ি মাটি আনতে হবে। আমি এক ঝুড়ি আনব। আর—"

"আর এক ঝুড়ি আমি। চল আর দেরী করিস নি। আজই আরম্ভ করতে হবে।"

ছুজনেই বেরিয়ে পড়ল। সাগরের ঘরের বারান্দায় সেইদিনই শুরু হয়ে গেল মূর্তি তৈরি। উল্কির নির্দেশমত বিতস্তাও সাহায্য করতে লাগল তাকে। বিতস্তার সমস্ত মন শুধু একাগ্র নয়, পুষ্পিত হয়ে উঠল যেন। তারপর মূর্তি ছুটি যখন আস্তে আস্তে মূর্ত হতে লাগল, বিস্তৃতা দুরুদুরু-বক্ষে নির্ণিমেষে চেয়ে রইল তাদের দিকে। আসবে কি সত্যি ওরা ?

মন্দাকিনী স্বল্প-ভাষিণী। সে একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। আশ্রমের সঙ্গিনী তিনজন—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী—হতাশ হয়েছিল, কিন্তু অতটা মুষড়ে পড়ে নি। তারা আশ্রমের কাজকর্ম বন্ধ করে নি। রান্নাবাড়া করছিল, আশ্রম পরিস্কার রাখছিল, মাঠে যাওয়া বন্ধ করে নি। মন্দাকিনী একেবারে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। সে ফুরিয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রচালিতবৎ স্নানাহার করছিল সে। চোখ বুজে শুয়েও থাকত সে অনেকক্ষণ, ঘুমোত না কিন্তু। কথা বলছিল না একেবারে। সে ভাবছিল এবার তার কি করা উচিত। সে একদিন রাজকন্যা ছিল। একটা বিষাক্ত সাপের দংশনে নির্বাপিত হয়ে গিয়েছিল তার জীবন। সন্ন্যাসী অর্ণব তাকে বাঁচালেন, বিবাহ করলেন, সন্ন্যাসিনী জীবনে দীক্ষিত করলেন, তার বাবাকে বললেন—রাজকন্যারূপে আপনার কন্যার আয়ু নিঃশেষ হয়ে গেছে। সন্নাসিনী-রূপে সে এখন বেঁচে থাকতে পারে।

লোহিতরাজ্য থেকে নিয়ে এলেন তাকে এখানে। তারপর যা ঘটলো তা আশ্চর্য। তা অলৌকিক। তাকে সেবা করবার জন্য হিমালয় কন্যারা নেবে এলেন। তার ভরণপোষণের জন্য পরম গুণবান, পরম রূপবান রত্নাকর প্রচুর জমি দান করলেন তাঁকে, আশ্রম বানিয়ে দিলেন। মহাতপস্বী অর্ণবের নাগাল পাওয়ার জন্য সে দিবারাত্রি কৃচ্ছ্র-সাধন করতে লাগল। চিরকাল আদরে লালিত

রাজকন্যা ভূমি শয্যায় শুয়েছে, একবেলা আহার করেছে, পরিধান করেছে এমন বস্ত্র যা তাদের বাড়ির দাসীরাও পরে না। তার বাবা গোপনে দুজন ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন তার খবর রাখবার জন্য, পাঠিয়েছিলেন অর্থ। কিন্তু সে গ্রহণ করে নি কিছু। ফিরিয়ে দিয়েছে চাকরদের। কেন? কারণ সে আশা করেছিল অর্ণবের নাগাল পাবে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সে বুঝতে পারল অর্ণব মহাকাশ, সে সামান্য ঘুড়ি। আকাশকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার সাধ্য তার নেই। কোনও কালে হবে না। কিছুদিন আগে লোহিতরাজ্য থেকে আবার দুজন ভৃত্য এসেছিল। তখনও তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিল সে। তখন রত্নাকরের মহত্ত্বে তার মন অভিভূত। সহসা আজ তার জীবনের সূর্য-চন্দ্র দুই-ই নিবে গেল। এখন সে কি করবে? নির্বাক হ'য়ে এই কথাই ভাবছিল সে। অনেক ভেবে ঠিক করলে বাবার কাছে লোহিতরাজ্যেই ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে রাজকন্যার জীবনই যাপন করবে। অর্ণব বলেছিলেন তাহলেই তার মৃত্যু হবে। তাই হোক। এখন আর বেঁচে লাভ কি। হঠাৎ একদিন সে গঙ্গাকে বলল—"আমাকে তোমরা লোহিতরাজ্যে নিয়ে চল। এখানে আমি আর থাকব না।"

"কেন?"

"এখানে আর ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে এখানে থাকার আর সার্থকতা নেই। আমি বাবার কাছে ফিরে যাই।" যমুনা আর সরস্বতীও সেখানে ছিল। একটু রহস্যময়ভাবে তারা তিনজনই চেয়ে রইল তার দিকে। মনে হল কি যেন একটা গোপন করতে চাইছে।

"লোহিতরাজ্যে কোনদিক দিয়ে যেতে হয় তা তোমরা জান কি?"

যমুনা তখন বলল—"জানি। তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিতেও পারতাম। কিন্তু লোহিতরাজ্যে গিয়ে এখন লাভ হবে না।"

"কেন? সেখানে আমার বাবা আছেন। সে দেশের রাজা তিনি—"

"কয়েকদিন আগে লোহিতরাজ্য থেকে তোমাদের একটি চাকর এসেছিল। তাকে আমরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিই নি—"

"কেন?"

"সে দুঃসংবাদ এনেছিল একটি।"

"কি দুঃসংবাদ?"

"গঙ্গারাঢ়িরা তাদের বিপুল হস্তী-বাহিনী নিয়ে লোহিতরাজ্য আক্রমণ করেছিল। তোমার বাবাকে তারা হত্যা করেছে। লোহিতরাজ্য এখন তাদের দখলে।"

এ খবর শুনে বজ্রাহতবৎ বসে রইল মন্দাকিনী। তারপর করুণ কণ্ঠে বলল—"কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন।"

হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে করুণ কণ্ঠে বলতে লাগল—"কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন—।"

তারপর আশ্চর্য একটা কাণ্ড হল। হঠাৎ সে পাখী হয়ে গেল। পাখী আকাশের মহাশূন্যে উড়ে গেল আর উড়তে উড়তে ক্রমাগত বলতে লাগল—"কি করি এখন, কি করি এখন, কি করি এখন—।" গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী হিমালয়ে ফিরে গেল।

রত্নাকরের প্রকাণ্ড ফুল-বাগানে একা-একা রোজ ঘুরে বেড়াত ফল্গু। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানোর পর নানারকম ফুল তুলত একমনে। মালা-গাঁথত গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে। মালাটা গাঁথা হয়ে গেলে সেটা টাঙিয়ে দিত একটা গাছের ডালে। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে দেখত সেটা। মুখে ফুটত ছোট্ট একটু হাসির আভাস।

## ॥ ২০ ॥

আবার একদিন গভীর রাত্রে তিন্তিড়ীর গাঁজার দোকানে হাজির হলেন ভৃঙ্গী। তিন্তিড়ী দ্বার খুলতেই তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন।

"সমুদ্র মন্থন দেখতে চাও যদি এক্ষুণি আমার সঙ্গে সুমেরু পর্বতে যেতে হবে। সেখান থেকে বেশ ভালো দেখতে পাবে। আগে এক ছিলিম সাজ। চাঙ্গা হয়ে নি। দুটো সিংহ আর একটা সাপ হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে আমাকে। তোমার সেই ভালো গাঁজা আছে তো?"

"আছে, প্রচুর আছে। ও গাঁজা তো বেশী বিক্রী হয় না।"

"যা আছে সেটা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সুমেরু পর্বতে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। সেখানে ঘন ঘন গাঁজা খেতে হবে। এখন এক কলকে সাজ।"

তিন্তিড়ী গাঁজা সাজতে বসল। বলল—"ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সিংহ সাপের পাল্লায় পড়লেন কি করে?"

মহেশ্বর সমুদ্রমন্থন করবেন কি-না একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। দেবতাদের আর দৈত্যদের ডেকে একদিন বললেন—"তোমরা অমর হতে চাইছ? বায়না ধরেছ সুধা খাবে। কিন্তু তার আগে একটি কথা জেনে রাখ। সুধা খেলে অমর হবে বটে কিন্তু ষড়-রিপুর কবল থেকে মুক্ত হবে না। সুতরাং জীবনে নানারকম দুর্গতি ভোগ করতে হবে। যারা অমর নয়, মৃত্যু তাদের মুক্তি দেয়। কিন্তু তোমরা যদি অমর হও তাহলে অমরত্বের বেড়াজালে ঘেরে ষড়-রিপু অসীম যন্ত্রণা দেবে তোমাদের। ভেবে দেখ জিনিসটা ভালো ক'রে। দেব-দৈত্য তোমরা কেউ ষড়-রিপু মুক্ত নও। সুতরাং ভেবে দেখ ভাল করে।"

দেবতারা আর দৈত্যরা কিন্তু না-ছোড়। তারা অমরত্বই চাইতে

লাগল। মহেশ্বর তবু ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝড়ে রত্নাকরের নৌবহর সব ডুবে গেল। সে নৌবহরে মহাদেবের সাতজন ভক্ত ছিলেন। রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, অব্ধি, পারাবার, সাগর আর অর্ণব। এরা যখন সমুদ্রে তলিয়ে গেল তখন মহাদেব বিচলিত হয়ে উঠলেন। সমুদ্রকে খবর পাঠালেন আমার সাতজন ভক্তকে অবিলম্বে তীরে উঠিয়ে দাও। ওরা আমার পরম ভক্ত। সমুদ্র উত্তর দিলেন—দেবাদিদেব তা আমার সাধ্যাতীত। কে কোথায় তলিয়ে গেছে আমার পক্ষে তা নির্ণয় করা সহজ নয়। এই উত্তর শুনে ক্ষেপে উঠলেন মহেশ্বর। বললেন—তোমাকে আমি মন্থন করব। ওদের আমি তুলবই। সুতরাং সমুদ্র-মন্থন হবে এবার। গাঁজার কলকেটি ভৃঙ্গীর হাতে দিয়ে তিন্তিড়ী বললেন—"যাদের নাম করলেন তারা তো আমাদের অঞ্চলের লোক। সবাইকে আমি চিনি—।"

ভৃঙ্গী বলল—"তা তো চিনবেই। ওদের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমি জানি। ওরা একই প্রার্থনা রোজ করছে। আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি প্রত্যেকের প্রার্থনা রোজ সংগ্রহ করি। ওদের প্রার্থনা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। একই প্রার্থনা দিনের পর দিন করছে ওরা। দেখাব তোমাকে সব।"

কলকেতে সুদীর্ঘ টান দিলেন ভৃঙ্গী। দমবন্ধ করে' বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ধোঁয়াটি ছাড়লেন ধীরে ধীরে।

তিন্তিড়ী বলল—"সিংহ আর সাপের কথা বলছিলেন যে—।"

"ও হ্যাঁ, মন্দর পর্বতে মহাদেবের অতি প্রিয় একটি সাপ আর দুর্গার অতি প্রিয় আদরের দু'টি সিংহ থাকে। মহাদেব আমাকে বললেন, ওদের ওখান থেকে নাবিয়ে আন। মন্দর পর্বত মন্থন-দণ্ড হবে, ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে হবে তাকে। সেখানে দুর্গার দুটি প্রিয় সিংহ আছে আর আমার প্রিয় সাপ আছে একটি। তাদের তুমি ওখান থেকে নাবিয়ে নিয়ে এস। ওখানে থাকলে বাঁচবে না ওরা। ওদের পিছনেই ছুটোছুটি করছিলাম। অতি কষ্টে নাবিয়েছি একটু

আগে। অনেক দেরী হয়ে গেল। গাঁজাগুলো গুছিয়ে নাও। আর দেরী করা চলবে না। চল বেরিয়ে পড়ি।"

"আমি যাব কি করে?"

"দশাঙ্গীকে এনেছি। তার মাথার উপর বসবে। সে তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

"দশাঙ্গী? সে কে?"

"প্রেত। তাঁর প্রত্যেক অঙ্গই দশগুণ বড়। মাথাটা একটা প্রকাণ্ড ঝুড়ির মত। হাত দুটো প্রকাণ্ড ডানা। নাকটা ঠোঁটের মত। দেখতে ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভারি ভাল মানুষ। তোমার ঘরে ঢুকতে পারবে না সে। মাঠে ব'সে আছে। চল যাই—।"

মাঠে বিরাটকায় দশাঙ্গী বসেছিল। সত্যিই ভয়ঙ্কর দেখতে।

ভৃঙ্গী বললেন—"দশাঙ্গী হেঁট হ। ইনি তোমার পিঠ বেয়ে মাথায় চড়বেন। তুমি এঁকে সোজা সুমেরু-পর্বতে নিয়ে যাও। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।" তিন্তিড়ী দশাঙ্গীর পিঠ বেয়ে মাথার উপর উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সোঁ করে আকাশে উড়ল দশাঙ্গী। ভৃঙ্গীও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্ধান করলেন। মনে হল শূন্যে মিলিয়ে গেলেন যেন।

সুমেরু পর্বতের এক গুহার ভিতর বসেছিল তিন্তিড়ী আর ভৃঙ্গী। সেখান থেকে বিরাট সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল সমুদ্রতীরে সমবেত দেবতাদের আর দৈত্যদের। কত কোটি যে তার ঠিক নেই। কিলবিল করছিল যেন। মন্দর পর্বত স্থাপিত হয়েছিল সমুদ্রের ভিতর। বিরাট অনন্ত নাগ জড়িয়ে রয়েছেন নভশ্চুম্বী মন্দর পর্বতকে। তখনও মন্থন আরম্ভ হয় নি। ভৃঙ্গী বললেন, এই ফাঁকে রত্নাকর, অম্বুধি, জলধি, সাগর, পারাবার, অব্ধি আর অর্ণবের প্রার্থনা-গুলো তোমাকে শুনিয়ে দিই। মহেশ্বর ওদের প্রার্থনা শুনবেন কি না জানি না। কিন্তু প্রার্থনাগুলো বড় অদ্ভুত। আর এই এক প্রার্থনাই ওরা রোজ করেছে, বছরের পর বছর।

প্রকাণ্ড কমণ্ডলু থেকে ভৃঙ্গী প্রার্থনার অনুলিপিগুলি বার করতে লাগলেন।

রত্নাকরের প্রার্থনা শোন।

"হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার কৃপায় আমি সচ্ছল অবস্থায় আছি। আমার ব্যবসা বিশ্বব্যাপী হয়েছে। আমার পত্নী তাপ্তি সতী সাধ্বী পতিব্রতা। সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী। সে আমাকে একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারে না। আমার কাছে অন্য কোনও রমণীর সান্নিধ্যও সহ্য করতে পারে না সে। কিন্তু ভগবান আমাকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে মেয়েরা স্বতঃই আমার দিকে আকৃষ্ট হয়। আমি ভদ্রতাবশত তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারি না। চক্ষুলজ্জাবশত তাদের কোনও অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারি না। আপনি জানেন তাদের কারো সম্বন্ধে আমার কোনও মোহ নেই। আমি কেবল তাদের সঙ্গে

ভদ্রোচিত ব্যবহার করি। তাপ্তি কিন্তু এতে বড় কষ্ট পায়। তাই আপনার নিকট আমার প্রার্থনা পরজন্মে আপনি আমাকে নারী করে সৃষ্টি করুন। আমার নারী দেহে তাপ্তির রূপ যেন মূর্ত হয়। তাপ্তিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আমাদের দুজনকে আপনি অবিচ্ছেদ্যরূপে মিলিত করে দিন। এই আপনার কাছে আমার প্রার্থনা। রত্নাকর এই প্রার্থনা প্রত্যহ করেছে।"

তারপর তিনি কমণ্ডলু হাতড়াতে লাগলেন আবার।

"বহু লোকের প্রার্থনা টুকেছি তো রোজ। সব হোগুল-মগুল হয়ে গেছে। দাঁড়াও ওদেরগুলো খুঁজে বার করি।"

হ্যাঁ, এই হচ্ছে অন্ধির। এটা শুনে নাও। অদ্ভুত প্রার্থনা।

"হে মহেশ্বর; আমার অসংখ্য প্রণতি গ্রহণ করুন। আমি পিশাচ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করব বলে অনেক রকম সাধনা করেছি। অনেক রকম সিদ্ধিলাভও করেছি। এই সাধনার জন্য অনেক সময় উত্তরসাধিকার প্রয়োজন হয়। আমি একে একে সাতাশজন নারীকে বিবাহ করেছিলাম এই জন্য। তারা সকলেই আমাকে ভালবাসত খুব। কিন্তু উত্তরসাধিকা রূপে তারা একজনও যোগ্য ছিল না। তারপর হঠাৎ পেয়ে যাই ভোগবতীকে। সে নিজে পিশাচ সিদ্ধ। কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রকৃতির স্ত্রীলোক। তাকে আমি যখন বিয়ে করলাম তার অত্যাচারে আমার সাতাশজন পত্নীই আমাকে ছেড়ে গেল। তাদের আর কোনও খবর পাই নি এতদিন। সম্প্রতি মা কালী একদিন আমাকে বললেন—তারা মরে গেছে এবং দক্ষ রাজার সাতাশ কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছে। ভোগবতী শক্তিময়ী। কিন্তু উন্মাদিনী। আমার সঙ্গে রোজ তার হাতাহাতি হয়। মনে হয় সেও আমাকে ছেড়ে যাবে। হে মহেশ্বর। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, আমার সেই সাতাশ পত্নীকে আপনি আবার ফিরিয়ে দিন। তারা আমাকে ভালোবাসত। আমি তাদের এখনও ভালবাসি। আপনি আমাদের পুনর্মিলন ঘটিয়ে দিন প্রভু। আমি আর কিছু চাই না।

আমি সারাজীবন আপনার সেবক, আপনি আমাকে যদি কোনও বর না দেন তাহলেও আমি আপনার সেবক থাকব। শুধু আমার অন্তরের গোপন কামনাটুকু আপনাকে নিবেদন করলাম।"

এটি পাঠ করে' ভৃঙ্গী বললেন "বাবাকে ভাল মানুষ পেয়ে এদের স্পর্দ্ধা কত বেড়ে গেছে দেখ। যার যা খুশী তাই আবদার করছে। এই অদ্ভুত প্রার্থনা রোজ করে যাচ্ছে লোকটা—।"

ভৃঙ্গী আবার কমণ্ডলুর ভিতর হাত ঢোকালেন এবং খানিকক্ষণ পরে খুঁজে পেলেন পারাবারের প্রার্থনা।

"পারাবারের প্রার্থনা পেয়েছি। শোন। এ যে কি চায় তা বোঝাই যায় না। মনে হয় একটা হেঁয়ালি। শোন।"—"হে মহেশ্বর, হে সঙ্গীত-শাস্ত্রের উৎস, হে সর্বজ্ঞানের আকর, হে মহানন্দ স্বরূপ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। সারাজীবন আপনার তপস্যা করছি, আপনার মহিমার সীমা নির্ণয় করতে পারি নি। আমি কবিতার প্রেরণা হয়ে আপনার মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছি, রোজই করি, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ি। শুনেছি সেবকদের আপনি বর দান করেন। আমার কাম্য ধন, মান, রূপ, আয়ু বা সামর্থ্য নয়। যদি আপনি অনুগ্রহ করে কখনও কিছু আমাকে দেন, সেই ক্ষমতা দিন যার দ্বারা আমি সকলকে উদ্দীপ্ত করতে পারি, আবিষ্ট করতে পারি, আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারি। আমি কবি, আমার কবিত্ব যেন অপরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে কিছুক্ষণের জন্যেও তাঁকে কবি করে তোলে।"

পড়া শেষ করে ভৃঙ্গী বললেন—"এর মানে কিছু বুঝলেন?"

তিন্তিড়ী বললে—"না পারলাম না—।"

"আমিও পারি নি।"

আবার কমণ্ডলুতে হাত ঢোকালেন। বার করলেন এক গাদা প্রার্থনা-পত্র ( অবশ্য ভূর্জপত্র ) তার ভিতর পাওয়া গেল অম্বুধি আর অর্ণবের প্রার্থনা।

"অম্বুধির প্রার্থনাটাই আগে শোন। এও এক অদ্ভুত প্রার্থনা করেছে। রোজই করে। শোন—"হে মহাদেব, হে আশুতোষ, আমি জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করি। আপনার মহিমার কিয়দংশ আমি ওই জ্যোতিষ শাস্ত্রের মধ্যেই অনুভব করছি। কিন্তু আমি পঙ্গু চলতে পারি না। দৃষ্টির জ্যোতিও ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। আমি সম্পূর্ণভাবে পর-নির্ভর হয়ে পড়েছি। আমার দুর্দশার অন্ত নেই। হে সর্বশক্তির আধার, হে দেবাদিদেব, আমাকে শক্তি দান করুন। আমাকে বলবান অশ্বের মত তেজোদ্দীপ্ত বলশালী করুন। হে উমাপতি, আমি আর কিছু চাই না।"

পড়া শেষ করে ভৃঙ্গী বললেন—"আশ্চর্য, মানুষ ঘোড়া হতে চাইছে। এইবার অর্ণবেরটা শোন। সে খুব সংক্ষেপে রোজ একই কথা বলে। "হে মহেশ্বর, আমি নারায়ণের বক্ষলগ্ন হয়ে থাকতে চাই। আর কিছু চাই না, আর কিছু চাই না। আপনি কৃপা করুন, আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়।"

ভৃঙ্গী আবার কমণ্ডলুর ভিতর হাত ঢোকালেন। প্রার্থনার অনুলিপি বার করলেন অনেকগুলি।

হরিশ্চন্দ্র, কালীসেবক, লৌহ মিত্র, ঈশ্বর দাস—জলধি দেবশর্মা।

জলধিরটা পাওয়া গেছে। শোন এটা।

"হে পরম পিতা, হে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের আদি প্রবক্তা, আমি আপনার দীন দাসানুদাস। আপনার নির্দেশ অনুসরণ করে আমি সারাজীবন আয়ুর্বেদ মতে চিকিৎসা করেছি। কখনও রোগী বাঁচে, কখনও বাঁচে না। যখনই কোন রোগীর মৃত্যু হয় তখনই আমি হতাশ হয়ে পড়ি। প্রকৃতির কাছে এই পরাজয় স্বীকার করতে অপমানে আমার মাথা কাটা যায়। মনে হয় যতদিন আমরা মানুষকে অমরত্ব দান না করতে পারব ততদিন আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। আমি সারাজীবন এটা নিয়ে গবেষণা করেছি, কিন্তু এখনও কৃতকার্য হতে পারি নি। আপনার কৃপা ভিন্ন

তা পারবও না। আমার প্রার্থনা, হে মহেশ্বর, আমি যেন সকলকে অমরত্ব দান করতে পারি। আমাকে আপনি সেই বর দিন। এ ছাড়া আমার আর কিছু কাম্য নেই।"

ভৃঙ্গী বললেন—"এর সাহসটা দেখ। সব মানুষ যদি অমর হয় কি কাণ্ডটা হবে ভেবে দেখ দিকি—।"

আবার কমণ্ডলুতে হাত ঢোকালেন ভৃঙ্গী। এবার বেশী খুঁজতে হল না। মল্লবীর সাগরের প্রার্থনা পত্র বেরিয়ে পড়ল।

ভৃঙ্গী বললেন "এর প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত।" শোন। "হে শিব, হে শঙ্কর, আমি সারাজীবন শক্তির সাধনা করেছি। ফল যা হয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি মাতঙ্গের মত বলশালী হতে চাই। আপনি আমাকে সেই বর দিন। আর কিছু আমি চাই না।" এই সাতজনই মহাদেবের প্রিয় ভক্ত। কিন্তু এদের অদ্ভুত আবদার শুনে আমি তো অবাক হয়ে গেছি। ওহে, দেখ, দেখ, সমুদ্র-মন্থন শুরু হয়েছে। তিন্তিড়ী চেয়ে দেখল মন্দর পর্বত ঘুরতে আরম্ভ করেছে। অনন্তনাগের মুখের দিকে দৈত্যরা আর পুচ্ছের দিকে দেবতারা ধরে মন্থন শুরু করছেন। তুমুল একটা শব্দ হচ্ছে। মন্দর পর্বতের উপর যে সব পাখী ছিল সেগুলি উড়ে আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। শব্দও করছে তারা নানারকম। মন্দর পর্বতের উপর যে সব বন্য-জন্তু ছিল তারা ভীত ত্রস্ত হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করছে। তাদের হুঙ্কার এবং গর্জনে চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে। তারা অনেকেই ব্যাকুল হয়ে সমুদ্রের মধ্যে লাফিয়ে পড়ছে। সাঁতরে পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না। সমুদ্রের ঘুর্ণাবর্তে বারম্বার আবর্তিত হচ্ছে কেবল। মন্দর পর্বতের মন্থন-আবর্তে শত শত জলচর প্রাণীও ধর্ষিত হতে লাগল। বড় বড় হাঙ্গর, কুমীর, তিমি, তিমিঙ্গিলও এই ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত থেকে পালাবার জন্য নিজেদের শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে যা করতে লাগল তা যুগপৎ করুণ ও ভয়ঙ্কর। সেই ঘুর্ণাবর্তে আবার পড়ে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তারা। বড় সামুদ্রিক সর্পরা মন্দরকে

আঁকড়ে ধরে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। সেই বিরাট ঘূর্ণাবর্ত তাদেরও গ্রাস করে ফেলল। একটা অবর্ণনীয় গর্জনে, চিৎকারে, আর্তনাদে, সমুদ্রের কল্লোলে, চারদিক যেন কাঁপতে লাগল। নভশ্চুম্বী মন্দর পর্বতের উপর অসংখ্য বৃক্ষ, অসংখ্য লতা, অসংখ্য গুল্ম। ঘূর্ণনের বেগে তারাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

গাছে গাছে ঠোকাঠুকি হয়ে অনেক গাছের শাখা ভেঙে গেল, কোনও গাছ সমূলে উৎপাটিত হল, প্রবল ঘর্ষণের জন্য অনেক গাছের ছাল উঠে গিয়ে রস গড়িয়ে পড়তে লাগল। মন্দর সবেগে ঘুরতে লাগল। কয়েকটি কিন্নরও ছিটকে পড়ে মারা গেল এবং সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে আবর্তিত হতে লাগল। ক্রমশ বড় বড় পাথরও বিক্ষিপ্ত হতে লাগল মন্দর পর্বতের গা থেকে। যেন মনে হতে লাগল ছোট ছোট এক একটা পাহাড় খসে পড়ছে। অনেক গাছে গাছে ঘষাঘষি হয়ে আগুন লেগে গেল। দাবানল সৃষ্টি হল মন্দর পর্বতের উপর। মন্দর তবুও সবেগে ঘুরে যাচ্ছে। দেবতারা আর দৈত্যরা অক্লান্ত। ক্রমাগত টেনে যাচ্ছেন তারা মন্থন-রজ্জু। অনন্তনাগের খুব কষ্ট হচ্ছে, তবু তিনি নিজের বিষ সম্বরণ করে মহাদেবের আদেশ পালন করে যাচ্ছেন। মন্দর পর্বতের উপর দাবানলের ধূমে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হল। আগুনের লকলকে শিখা আকাশ স্পর্শ করল। শেষ কালে ইন্দ্রদেব মেঘদের আহ্বান করলেন। আদেশ দিলেন তোমরা বারি বর্ষণ করে' এ আগুন নেবাও। প্রচুর বৃষ্টি হতে লাগল। তারপর দেখা গেল বহু মৃত পশুপক্ষীর অর্ধদগ্ধ দেহ ছিটকে ছিটকে পড়ছে মন্দরের শরীর থেকে। নদীর স্রোতের মত নেবে আসছে বহু ওষধি আর বনস্পতির নির্য্যাস। মন্দর কিন্তু একদণ্ড থামছে না। ঘুরে চলেছে।

হঠাৎ ভৃঙ্গী বলে উঠলেন—"আর পারছি না। কানে তুলো দিয়ে চোখ বুজে বসে থাকি। তুমি এক কলকে সাজো দেখি।"

তিন্তিড়ীও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বসেছিল।

সে বললে—"আমাকেও একটু তুলো দিন প্রভু। এত শব্দ আর শুনতে পারছি না। দু'কলকে সাজছি। আমিও ঠাণ্ডা মেরে গেছি।"

তিন্তিড়ী দুটো বড় বড় কলকে বার করে গাঁজা সাজতে বসল। সব সাজ সরঞ্জাম সে সঙ্গে এনেছিল। চকমকি পর্যন্ত।

ভৃঙ্গী বললেন—"দেবতা এবার বোধ হয় সংহার মূর্তি ধরেছেন। প্রলয় করে ছাড়বেন। দেব দৈত্য নর বানর ভূত প্রেত কেউ আর রক্ষে পাবে না—। তুরীয় মার্গে চড়ে বসে থাকি। তারপর যা অদৃষ্টে আছে, হবে।"

তিন্তিড়ী চটপট দু'কলকে গাঁজা সেজে ফেললে। তারপর দু'জনেই গাঁজায় টান দিয়ে চোখ বুজে বসে রইল কানে তুলো দিয়ে।

গাঁজার নেশায় বিভোর হয়ে বসে রইল তারা কিছুক্ষণ। কিন্তু নেশা বেশীক্ষণ থাকে না। একটু পরে ভেঙে গেল। আবার চোখ খুলতে হল। চোখ খুলে যা দেখল তাতে আবার অবাক হয়ে গেল দুজনেই। নীর সমুদ্র ক্ষীর সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি চলে খালি ক্ষীর আর ক্ষীর। আর সেই ক্ষীর সমুদ্রে মন্থন করে চলেছে মন্দর। দেব দৈত্য অনন্তনাগ কেউ ক্লান্ত হন নি এখনও। মহাদেব সুমেরু পর্বতের আর একটি সু-উচ্চ শিখরের উপরে বসে আছেন বিরাট হিমাদ্রির মত। মাঝে মাঝে বলছেন—"মন্থন থামিও না। আমার সাতটি প্রিয় ভক্তকে আমি উদ্ধার করবই। এর জন্য সমুদ্রকে যদি শুকিয়ে ফেলতে হয়, শুকিয়ে ফেলব। সুধা উঠুক বা না-ই উঠুক—অব্ধি, রত্নাকর, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, সাগরকে আমি চাই। এদের প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। এদের সেই মূর্তি আমি দেখতে চাই। তারা মরে নি। তারা সমুদ্রের ভিতরেই আছে। সমুদ্র তাদের ফিরিয়ে দিক। যতক্ষণ না দিচ্ছে ততক্ষণ মন্থন চলবে—।"

মহাদেব নাসা বিস্ফারিত করে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

মন্থন চলতে লাগল।

এর পরই কিন্তু একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ক্ষীর ক্রমশ গলতে লাগল। তারপর অপরূপ একটা গন্ধ ছাড়ল। উৎকৃষ্ট ঘিয়ের গন্ধ। ক্ষীর সমুদ্রমন্থনের ঘূর্ণাবেগে ঘৃত সমুদ্রে পরিণত হল। ঈষৎ স্বর্ণাভ সেই ঘৃত-সমুদ্রে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হওয়াতে অপরূপ দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল চারদিক। মনে হল এইবার বুঝি অসম্ভব সম্ভব হবে।

হ'লও।

খানিকক্ষণ মন্থনের পর অপরূপ শোভায় চাঁদ উৎক্ষিপ্ত হলেন স্বর্ণ-সান্নিভ ঘৃত-সমুদ্র থেকে। হর্ষধ্বনি করে উঠল দেব-দৈত্য সকলেই। শীতাংশু চন্দ্রের অপরূপ কান্তি দেখে ভৃঙ্গী বললেন—"এ যে অভূত-পূর্ব হে।" তারপরই মহাদেবের গম্ভীর কণ্ঠরব শোনা গেল।

"বৎস অত্রি, তোমার তপস্যায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তুমি যা চেয়েছিলে তাই তোমায় দিলাম। তোমার সাতাশ পত্নী মহাকাশে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তুমি মহাকাশে চলে যাও। তুমি আমার পরমাত্মীয় হলে কারণ তোমার সাতাশ পত্নীর দিদি ছিলেন সতী। তুমি আমার শিরোভূষণ হয়ে থাকবে।"

চাঁদ মহাকাশে চলে গেলেন। আবার মন্থন চলতে লাগল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠলেন, লক্ষ্মী। তিনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্টা। গৌরবর্ণা, সুরূপা, স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, ডানহাতে পদ্ম, বাঁ-হাতে রত্নময় একটি ঝাঁপি। মনে হ'ল একটি আশ্চর্য জীবন্ত অনন্য প্রতিমা যেন মূর্ত হ'ল মহাশূন্যে। তিন্তিড়ী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল লক্ষ্মীর মুখের আদল ঠিক যেন তাপ্তি দেবীর মুখের মত। মহাদেব মন্দ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"বৎস রত্নাকর, তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত। ভয় হয়েছিল সমুদ্র বুঝি

তোমাকে গ্রাস করল। তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। তোমার মহিমা, তোমার সৌন্দর্য স্ত্রীরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তোমার পত্নী তাপ্তি তোমার সর্বাঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছেন। তুমি বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ কর।" বিষ্ণু নিকটেই ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। লক্ষ্মী তাঁর বাঁ-পাশে গিয়ে উপবেশন করলেন।

সমুদ্র মন্থন চলতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সমুদ্র থেকে যা উৎক্ষিপ্ত হল তা জীবন্ত একটি অগ্নি-শিখা। সেটি মহাকাশে সঞ্চরণ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে লাগল তার বর্ণ! আরও মনে হতে লাগল একটা নীরব উদ্দীপনাময় সঙ্গীত যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই যাদুকরী শিখার সর্বাঙ্গ থেকে। সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করে একটা আনন্দঘন মদিরতা যেন আবিষ্ট করে ফেলল চরাচরকে। তার কখনও মৃদু, কখনও উদাত্ত, কখনও গম্ভীর, কখনও চটুল প্রভাবে উন্মত্ত হয়ে উঠল দেবদৈত্যরা। মহাদেব ঘোষণা করলেন—"কবি পারাবার, তুমি যা প্রাথনা করেছ তা আমি দিতে পেরেছি কিনা জানি না। তুমি অনন্য প্রতিভাবান স্রষ্টা, তুমি কবি, তুমি সুরের জনক, তাই তোমাকে আমি সুরা-রূপে সৃষ্টি করলাম। তুমি যার সংস্পর্শে আসবে তাকে উদ্দীপ্ত করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কল্পনার তুঙ্গলোকে। ভুলিয়ে দেবে তার পার্থিব সুখ-দুঃখ। সে-ও ক্ষণিকের জন্য কবি হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার প্রতিভা পাবক-স্বরূপ। তুমি ছাড়া আর কেউ তা সহ্য করতে পারবে না। অধিকাংশ লোকই পুড়ে যাবে। তুমি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল যেখানে ইচ্ছে সঞ্চরণ করতে পার।"

সুরা বিচিত্র লীলায় লীলায়িত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল। মহাদেব আদেশ দিলেন—মন্থন চলুক। সুরার প্রভাবেই সম্ভবত দেব এবং দৈত্যরা খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারা সবেগে আবার মন্থন করতে লাগলেন। একটু পরেই বিপুল হ্রেষারব করতে করতে সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠল বিরাট একটি অশ্ব। তার গ্রীবাভঙ্গী, তার পেশল

জঙ্ঘা, বিস্তৃত বক্ষ, তার ভাষাময় প্রদীপ্ত চক্ষু, তার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র তার সমস্ত অঙ্গের ক্ষিপ্র সতেজ ভঙ্গিমা—সমস্ত আকাশকেই যেন চঞ্চল করে তুলল। মহাদেব ঘোষণা করলেন—বৎস, অম্বুধি, নররূপে তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না। তুমি যা চেয়েছিলে আমি তাই তোমাকে করেছি। তুমি আর পঙ্গু পর-নির্ভর অম্বুধি নও, তুমি আজ থেকে হলে হয়-রাজ উচ্চৈঃশ্রবা। মহাকাশে পরিভ্রমণ করে তুমি জ্যোতিষ্কদের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ কর। স্বয়ং ইন্দ্রদেব তোমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। উচ্চৈঃশ্রবা মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—মন্থন চলুক।

আবার মন্থন শুরু হল। অনেকক্ষণ মন্থন করবার পরও কিন্তু আর কিছু সমুদ্র থেকে উঠল না।

ভৃঙ্গী বলল—"তিন্তিড়ী আর এক কলকে সাজ। এ কাণ্ড কতক্ষণ চলবে কে-জানে।"

তিন্তিড়ী পুনরায় গাঁজা সাজতে বসল।

দেব-দৈত্যরা সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল—"সুধা কই, সুধা কই।"

মহাদেব উত্তর দিলেন—"মন্থন করে যাও, সুধা উঠবে।"

মন্থন চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে চতুর্দিকে আলোকিত করে সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত উদিত হলেন একটি মণি।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—"পরম তপস্বী অর্ণব, এতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম। তুমি নারায়ণের বক্ষলগ্ন হতে চেয়ে ছিলে, তাই তোমাকে মণি-রূপে সৃষ্টি করলাম। আজ থেকে মণি-শ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ মণিরূপে বিখ্যাত হবে।"

কৌস্তব মণি উত্তর দিলেন—"প্রভু, আমি যদি আপনার বক্ষলগ্ন হই, আপনি কি আপত্তি করবেন?"

"করব। আমার অঙ্গে কোন ভাল জিনিস নেই। আমি সর্বাঙ্গে

ভস্ম মাখি, হস্তী-চর্ম্ম পরিধান করি। আমার গলার হার সাপ। পৃথিবীতে সবাই যা পরিহার করে আমি তাই গ্রহণ করি। তুমি নারায়ণের বুকে যাও। সেখানেই তোমাকে মানাবে ভালো।"

নারায়ণ নিকটেই ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। কৌস্তভ তার বক্ষে গিয়ে শোভমান হলেন।

দেবতা এবং দৈত্যরা আবার চিৎকার করে উঠলেন—"সুধা কই, সুধা কই—"

মহাদেব সেই একই উত্তর দিলেন—"মন্থন কর, আরও মন্থন কর।"

আবার মন্থন চলতে লাগল।

এরপর সমুদ্র থেকে উঠলেন এক সৌম্যকান্তি পরম রূপবান দেবতুল্য ঋষি। তাঁর হাতে একটি বৃহৎ কমণ্ডলু।

মহাদেব ঘোষণা করলেন—"বৎস জলধি, তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করেছি। তোমার হাতে যে কমণ্ডলু আছে তা সুধায় পরিপূর্ণ। এ সুধা যে পান করবে সেই অমর হবে। তুমি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী একজন। তাই তোমার হাতেই সুধা বিতরণের ভার দিলাম। আজ থেকে তোমার নামকরণ হল ধন্বন্তরী। তুমি যাকে খুশী অমরত্ব দান কর—।"

ধন্বন্তরী সুধার কমণ্ডলু হাতে নিয়ে দেবতাদের দিকে চলে গেলেন। মহাদেব ঘোষণা করলেন—"আরও মন্থন কর। সমুদ্র এখনও অনেক জিনিস লুকিয়ে রেখেছে।"

আবার শুরু হল মন্থন। প্রবল বেগে শুরু হল। ঘৃত-সমুদ্র ফেনায়িত হয়ে উঠল। মনে হল যেন আর্তনাদ করছে। মন্থন-রজ্জু অনন্তনাগও আর যেন নিজেকে সম্বরণ করতে পারছিলেন না।

হঠাৎ সমুদ্রের ভিতর থেকে বিরাট একটি স্তম্ভ নির্গত হল। তারপরই বিশালকায় এক শ্বেতহস্তী উল্লম্ফন দিয়ে বেরিয়ে এল সাগরের ভিতর থেকে। তাঁর গগন-বিদারী বৃংহিত, তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

চারটি দাঁত, তার নভশ্চুম্বী বিরাট শুঁড়, তার শ্বেত চন্দনের মত শুভ্র বর্ণ, তার রত্নোজ্জ্বল রক্তাভ চক্ষু যুগল, তার বলিষ্ঠ বিশাল স্তম্ভাকৃতি পদচতুষ্টয় দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল খানিক ক্ষণের জন্য। মহাদেব ঘোষণা করলেন—"আমার প্রিয় ভক্ত মল্লবীর সাগর, তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ তো? তুমি যা প্রার্থনা করেছিলে তাই দিয়েছি আমি। জানি না দেব দৈত্য কে তোমাকে পালন করবে। তোমার নতুন নামকরণ করেছি। আজ থেকে তুমি ঐরাবত বলে খ্যাত হবে—।"

দেবরাজ ইন্দ্র এগিয়ে এলেন। বললেন—"মহামাতঙ্গ ঐরাবত, আমি তোমাকে পালন করব। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।"

ঐরাবত হাঁটু গেড়ে বসল এবং শুঁড়টি বেঁকিয়ে তুলে ধরল। ইন্দ্র সেই শুঁড়ে পা রেখে ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলে গেলেন। এর পরই বিষ উঠল। অনন্তনাগ বিষ বমন করতে লাগলেন। চতুর্দিক কটুগন্ধে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

ভৃঙ্গী তিন্তিড়ী দুজনেই মূর্চ্ছা গেলেন। দৈত্যদের মধ্যেও মারা গেল কয়েকজন। বিরাট ঘৃত-সমুদ্র বিষ-সমুদ্রে পরিণত হয়ে গেল। আকাশ নীল কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল।

ব্রহ্মা এতক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। তিনি বললেন—"মহেশ, তুমি কি আমার সৃষ্টিটি একেবারে লোপ করে' দিতে চাও?"

এরপর মহাদেব একটি অত্যাশ্চার্য কাণ্ড করলেন। এক চুমুকে সমস্ত বিষ পান করে ফেললেন। তার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়ে গেল।

. সমুদ্র আবার শান্ত হল। মহাদেব আবার সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন। ধর্ম্মা, পারিজাত প্রভৃতি আরও অনেক দ্রব্য উঠেছিল সমুদ্র থেকে। কিন্তু সে কাহিনী আমার গল্পের অন্তর্গত নয়। অব্ধি, রত্নাকর, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, আর সাগরের কাহিনীই আমি বলতে শুরু করেছিলাম, সে কাহিনী এখানেই শেষ হল।

## ॥ ২২ ॥

এর পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, নর্মদা, ইরাবতী, ব্রাহ্মণী, কাবেরী, বিতস্তা, পদ্মা, ফল্গু, এরা সবাই সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। মন্দাকিনীও উড়তে উড়তে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছেছিল। ইন্দ্রাণী শচী দেবী তার কষ্ট দেখে তাকে মন্দাকিনী নদী করে দিয়েছিলেন এবং মর্ত্ত্যের গঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তাকে সেও সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। ভোগবতী পাতালে গিয়ে পাতাল-গঙ্গা হয়েছিল। তারও সমুদ্রের সঙ্গে মিলন ঘটেছে। সমুদ্রের আর এক নাম রত্নাকর। তারা যে রত্নাকরকে ভালবেসেছিল, তাকে পেলে তারা যে আনন্দ পেত সে আনন্দ কি তারা সমুদ্রে গিয়ে পেয়েছে? জানি না।

শেষ